মহারাজা হরিশ্চন্দ্র

(দানবীর)

(পৌরাণিক নাটক)

তরণীসেন বধ, সমাজ প্রণেতা

কমলেশ ব্যানার্জী

সুপ্রসিদ্ধ

"তপবন" যাত্রা পার্টিতে অভিনীত।

সাহিত্যমালা

১৮।২, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৭০০০০৬

হইতে প্রকাশিত

মূল্য - আট টা

ভূমিকা

আকাশে ঝড় উঠেছে—মেঘ ডাকছে—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—ঘরের বাইরে কেউ পা দিতে পারছে না—ঠিক এমনি দুর্যোগের রাত্রে বারাণসীর শ্মশানে মুখোমুখি দুটি ছায়া মূর্তি—একজন ঘাটের ঘাটোয়াল, আর একজন এসেছে তার মৃত পুত্রকে দাহ করতে—শ্মশান খরচ দেবার সামর্থ্য নেই তার—তাই ঘাটোয়াল তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল—হঠাৎ এক অঘটন—আকাশে ছোট্ট একটা বিদ্যুৎ চমক—আর সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্তন—যারা বাদানুবাদ করছিল, তারা হঠাৎ নিশ্চুপ—বৃষ্টি নামলো—না, আকাশ থেকে না—ওদের দুজনের চোখ থেকে।

পাঠকগণ! আপনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ চরিত্র দুটি কে কে? বলুন তো! হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন এরাই আমার এ নাটকের মুখ্য দুই চরিত্র—হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা। সেই কোন কৈশোরে আপনাদের মত আমিও এদের কাহিনী পড়েছি। তারপর জীবনের ঘাটে ঘাটে পাড়ি দেবার ফাঁকে ফাঁকে কত সুখ-দুঃখের মুহূর্তে সেই গল্প ফিরে ফিরে আমাকে উতলা করেছে, চঞ্চল করেছে। ভেবেছিলাম লিখবো। অবশেষে সে সুযোগ এলো। তপবন যাত্রা পার্টি আমাকে অনুরোধ করেন এই মর্মস্পর্শী কাহিনী নিয়ে নাটক লিখতে। নাটক আমি লিখি। কিন্তু নাট্য পরিচালক, পরিচালকের ক্ষমতাতে পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করেন। এর দায় অবশ্য তারই।

সুধী দর্শকবৃন্দ বিচার করবেন এর ফলে নাটকের মৌলিক কোনও দোষ ও গুণবৃদ্ধি হয়েছে কিনা।

মূল কাহিনী—মূল চরিত্র এবং মূল সংলাপই প্রকাশক প্রকাশ করলেন। ইহা যে সর্বজন সমাদৃত হবে একথা আমি বিশ্বাস করি। উক্ত পার্টির শিল্পীরা স্ব স্ব চরিত্রে অভিনয় করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুরকার—সুর সত্যিই মর্মস্পর্শী—সর্বশেষে জানাই আমার নাটকের প্রথম দুইখানা গান বন্ধুবর নাট্যকার শ্রীসুনীল চৌধুরী লিখেছেন এবং সুন্দর লিখেছেন—এদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ইতি—

কমলেশ ব্যানার্জী

যারা পরকে বাঁচাতে সর্বস্ব পণ করে—সর্বগ্রাসী মানুষের চক্রান্তে সর্বস্ব হারিয়ে যারা প্রাণখোলা হাসি হাসে—সেইসব মহাপ্রাণদের স্মরণ রাখতেই আমার কাঁচা হাতের লেখা "মহারাজা হরিশ্চন্দ্র"—উৎসর্গ করলাম।

ভাগ্যহত—

কমলেশ ব্যানার্জী

চরিত্র-লিপি

—পুরুষ—

হরিশ্চন্দ্র ... ... অযোধ্যার রাজা।
রোহিতাশ্ব .. ... ঐ পুত্র।
রাঘব রায় ... ... ঐ মন্ত্রী।
সত্যসন্ধ (ধর্ম) ... ... ঐ পূজারী।
মহেন্দ্র ... ... হরিশ্চন্দ্রের অনুচর।
কেশব ... ... মহেন্দ্রর পিতা।
বিক্রমজিৎ (অধর্ম) ... ... ঐ সেনাপতি।
বিশ্বামিত্র ... ... রাজর্ষি।
দেবানিক ... ... ঐ শিষ্য।
তীর্থনাথ ... ... ঐ রাজ্যের সাধক।
মহেশ ... ... চাঁড়াল।
দেবদূত ... ... ছদ্মবেশী নারায়ণ।

—স্ত্রী—

শৈব্যা ... ... অযোধ্যার রানী।
কুমতি ... ... অধর্মের স্ত্রী।
সন্ধ্যা ... ... মহেন্দ্রর স্ত্রী।
ময়না ... ... মহেন্দ্রর বোন।

। অভিনয়কালে নাটকের নাম বদল করা নিষিদ্ধ।

মহারাজা হরিশচন্দ্র

——:(০):——

প্রথম দৃশ্য ।

সরযুর তীর ।

তীর্থনাথের প্রবেশ ।

তীর্থ। ওঁ রক্তাং যুগ্ম ভয়দায়স্ত দশকুণ্ডল ভূষিতাং, বৃষভানু স্থত দেব নমামি হরি প্রিয়াম।

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্,
ধান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম।

(সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম)

[নেপথ্যে অধর্মের উচ্চহাসি]

—কে হাসে! কে হাসে! একি—আকাশ হঠাৎ এমন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো কেন! কেন সরযুর জল এমন ফেঁপে ফুলে উঠলো! কেন ঐ বজ্রপাত—কেন ঐ উল্কাপাত! অসময়ে কেন প্রকৃতি আজ এই নূতনভাবে সাজলো! [আবার অট্টহাসি] আবার—আবার সেই প্রাণ কাঁপানো অট্টহাসি। একি—কেন এই অমঙ্গলের আভাস ভেসে আসছে আজ আকাশে বাতাসে!

অধর্মের প্রবেশ ।

অধর্ম। তুমি ভুল দেখছো ব্রাহ্মণ—এ অমঙ্গলের আভাস নয়—পৃথিবীর বুকে আমার শুভ পদার্পণে আমাকে সম্বর্ধণা জানাচ্ছে।

তীর্থ। কে—কে তুমি?

অধর্ম। দেবতা।

তীর্থ। দেবতা—!

অধর্ম। হ্যাঁ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, আদি তেত্রিশ-কোটি দেবতার মত আমারও দেব অংশে জন্ম—আমিও দেবতা।

তীর্থ। দেবতা—দেবতা—

অধর্ম। ঐ দেখ—আমার ইচ্ছায় আকাশ মেঘমুক্ত হয়েছে, বজ্রের গর্জন থেমে গেছে, শান্ত হয়েছে সরযুর জল।

তীর্থ। সত্যিইতো—দেখতে দেখতে সেই বিভীষিকার দৃশ্য কোথায় মিলিয়ে গেল! দুর্যোগের আর কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না! দেবতা—দেবতা, সত্যিই কি তুমি এই দীন হীন তীর্থনাথকে দর্শন দিয়ে ধন্য করতে এসেছো! না আমি স্বপ্ন দেখছি!

অধর্ম। স্বপ্ন নয়—মনের ভুল নয়, সত্যিই তুমি জেগে আছো, সত্যিই আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

তীর্থ। সত্যি! আঃ—ধন্য—ধন্য আজ আমার জীবন। তুমি আমার প্রণাম নাও দেব। অজ্ঞান অধম আমি, তোমাকে চেনার শক্তি আমার নেই। বল—বল দেব, দেবলোকে অথবা এই পৃথিবীতে কি নামে পরিচিত তুমি?

অধর্ম। সময় হলে সবই জানতে পারবে। এখন শোন ব্রাহ্মণ, আমি জানি, তুমি বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছো। অন্ন-বস্ত্রের তোমার বড়ই অভাব। তাই তোমার জীবন যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটে আমি তোমাকে সেই উপদেশ দিতে এসেছি।

তীর্থ। না-না প্রভু, সুখের আমার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর—আমি যেন এই দুঃখ কষ্টের মধ্যেই সারাজীবন তোমার চরণ বন্দনা করে যেতে পারি।

অধর্ম। কিন্তু পৃথিবীতে এসে যদি ভোগই না করলে—এর রূপ, রস, গন্ধ থেকে বঞ্চিত থাকলে—তাহলে মানুষের জীবনের স্বার্থকতা কোথায় ?

তীর্থ। এ তুমি কি বলছো দেব !

অধর্ম। ঠিকই বলছি ব্রাহ্মণ, আমার নির্দেশিত পথে যদি চল—আমার কথামত যদি কাজ কর—তাহলে তোমার কোন অভাব থাকবে না। রাজপ্রাসাদে বাস করবে। সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যাবে—রাজভোগ খেতে পাবে।

তীর্থ। বুঝেছি—বুঝেছি প্রভু, তুমি আমাকে ঐশ্বর্য দিয়ে পরীক্ষা করতে চাও। না-না-না-প্রভু, ঐশ্বর্য আমি চাই না। ঐশ্বর্যের মোহে অন্ধ হয়ে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়, বিবেক বুদ্ধির গলা টিপে ধরে ধর্মকে পায়ের তলায় পিষে মারে।

অধর্ম। আমিও তো তাই চাই।

তীর্থ। প্রভু—দেবতা—

অধর্ম। ধর্ম—ধর্ম—ধর্ম, সারাজীবন ধর্মের আরাধনা করে কি পেয়েছো ব্রাহ্মণ ? কিছুই না।

তীর্থ। প্রভু—প্রভু, অজ্ঞান অধম আমি, আমার সঙ্গে একি ছলনা প্রভু !

অধর্ম। ছলনা নয়—যা বলছি সব সত্যি। চেয়ে দেখ ব্রাহ্মণ এই জগতের দিকে, চিরদিন যারা ধর্মপথে চলে আসছে, ধর্মের স্তুতিগান করছে—তারা কেউ সুখী নয়। অভাব, দুঃখ, জ্বালা, তাদের ঘরে লেগেই আছে। অশান্তির আগুনে তারা দিনরাত জ্বলে-পুড়ে মরছে। অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে তারা দিনরাত মরণ কামনা করছে।

তীর্থ। বল না—বল না প্রভু, ওকথা শোনাও মহাপাপ।

অধর্ম। আঃ, চুপ কর ব্রাহ্মণ।

তীর্থ। ধর্ম যদি সহায় থাকে—অন্ধকারেও আলোর সন্ধান পাওয়া যায়—বিষও অমৃত হয়ে যায়।

অধর্ম। সাবধান ব্রাহ্মণ, বারবার ধর্মের স্তুতিগান করে আমাকে উত্যক্ত করে তুল না। যদি সুখী হতে চাও, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে সংসার করতে চাও—তাহলে ছলনা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার কর। যজ্ঞসূত্র ছিঁড়ে ফেলে দাও—ধর্মের টুটি টিপে মার।

তীর্থ। কে—কে তুমি! তোমার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলছে কেন! নিঃশ্বাসে ধ্বংসের ইঙ্গিত মনে হচ্ছে কেন! তুমি—তুমিতো দেবতা নও! সত্য করে বল—কে তুমি ছদ্মবেশী?

ধর্মের প্রবেশ।

ধর্ম। মূর্তিমান—অধর্ম।

তীর্থ। অধর্ম!

অধর্ম। একি—এখানেও তুমি!

ধর্ম। যেখানে তুমি, সেখানে আমাকে আসতেই হবে।

তীর্থ। অধর্ম—অধর্ম। এইবার আমি বুঝেছি—কেন তোমার পদার্পণে আমি অমঙ্গলের দৃশ্য দেখেছিলাম। কিন্তু তুমি কে দেব? তোমাকে দেখে কেন আমার মনে এমন ভক্তির প্লাবন বয়ে চলেছে! বল—বল কি তোমার পরিচয়?

ধর্ম। যাকে সহায় করে জগতের জীব—ন্যায়, নিষ্ঠা ও সত্যপথে চলতে শেখে, যাকে ভালবেসে মানুষ হাসিমুখে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে পারে, যাকে তোমার মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে আজ এই অধর্মকে পরাজিত করেছ—আমি সেই ধর্ম।

তীর্থ। ধর্ম—ধর্ম—তুমিই ধর্ম! ভাগ্যবান—ভাগ্যবান এই তীর্থনাথ, তাই আজ তোমার দর্শন পেয়েছে। আমার প্রণাম নাও দেব! আশীর্বাদ কর—শত বিপদের মধ্যেও আমি যেন তোমার নাম স্মরণ করে চলতে পারি।

অধর্ম। ব্রাহ্মণ—

তীর্থ। ফিরে যাও অধর্ম। এটা ধর্মপ্রাণ দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব। এখানে তোমার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এখানকার রাজা থেকে আরম্ভ করে দীনতম প্রজারা পর্যন্ত একটা কথাই জানে—

অধর্ম। কি?

তীর্থ। যথা ধর্ম তথা জয়— [প্রস্থান।

অধর্ম। যথা ধর্ম তথা জয়—না-না, একথা আমি মানি না। ধর্মের এ আধিপত্যকে আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না।

ধর্ম। তুমি স্বীকার না করলেও সৃষ্টির সূচনা থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত জগতের জীব ধর্মের আধিপত্য মেনে আসছে, দেবতারা ধর্মকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে, এমনকি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও ধর্মের উপর আস্থা স্থাপন করেন।

অধর্ম। এ তার পক্ষপাতিত্ব।

ধর্ম। পক্ষপাতিত্ব!

অধর্ম। নয় তো কি? ধর্মই যদি জগৎ জুড়ে থাকবে তাহলে সৃষ্টি-কর্তা আমাকে সৃষ্টি করেছেন কেন?

কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। আমারও ঐ একই প্রশ্ন—সৃষ্টিকর্তা আমাকেই বা সৃষ্টি করেছেন কেন?

ধর্ম। এসো—এসো অধর্মের জীবন সঙ্গিনী কুমতি সুন্দরী।

অধর্ম। কি সংবাদ কুমতি, তোমাকে এত রাগান্বিত মনে হচ্ছে!

কুমতি। রাগবো না! আমি যে সংসারে প্রবেশ করি প্রথমে তারা আমাকে সাদরে বরণ করে নেয়, আমার ইঙ্গিত-মত চলে, আমার কথামত কাজ করে—আমিও মহাসুখে থাকি। কিন্তু যখনই এই ধর্ম আর ওর সহধর্মিণী সুমতি সেই সংসারে আশ্রয় নেয়—তখনই তারা আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

ধর্ম। নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবে। ভুল করে প্রলোভনে পড়ে প্রথমে তারা তোমাকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু যখনই বুঝতে পারে তুমি তাদের নরকের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছো—তখনই তাদের মোহ কেটে যায়। তাই তারা ধর্মের পায়ে আশ্রয় নেয়।

কুমতি। বল স্বামী—বল, জগতের সকলেই যদি ধর্ম পথে চলে, সুমতির অনুগত হয়—তাহলে আমাদের স্থান কোথায়?

ধর্ম। নরকের অন্ধকারে।

অধর্ম। নরকের অন্ধকারেই যদি আমাদের থাকতে হয়—তাহলে গোটা পৃথিবীকেই আমি একটা বিরাট নরককুণ্ড তৈরী করব।

ধর্ম। তার জন্য তোমাকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে অধর্ম।

অধর্ম। কতদিন?

ধর্ম। দিন নয়—যুগ। সত্য—ত্রেতা—দ্বাপর অবসানে কলির শেষ প্রান্তে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

অধর্ম। কলির শেষ প্রান্তে!

কুমতি। না না, এতদিন আমরা অপেক্ষা করব না স্বামী।

অধর্ম। ঠিক বলেছ কুমতি। তার আগেই আমি আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবোই করবো।

ধর্ম। অনেক তো চেষ্টা করেছো অধর্ম। তুমি আর তোমার লীলা সহচরী কুমতি বহুবার দেবতা—দানব—মানবের উপর প্রভাব বিস্তার করেছো, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারোনি। তাই প্রতিবারই এই ধর্মের কাছে তোমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

অধর্ম। এবার আর পরাজয় স্বীকার করবো না। তাই প্রস্তুত হয়েই আমি মর্তের মাটিতে পা দিয়েছি। এইবার আমি দেখবো ধর্ম—কোন গুণে তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ধর্ম। বেশ, এতই যখন তোমার আশা—তখন আমিও আমার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে প্রস্তুত।

অধর্ম। তাহলে শোন ধর্ম, লোকে বলে—ধর্মরাজ্য এই অযোধ্যা নগরী। তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ধর্মপ্রাণ হরিশ্চন্দ্র এখানকার রাজা। তাই আমার ইচ্ছা, আমি ছদ্মবেশে তার কাছে আশ্রয় নেব। কিন্তু কেউ কারও পরিচয় দেব না। শুধু নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে যাবো।

ধর্ম। মূর্খ অধর্ম, ধর্মপ্রাণ হরিশ্চন্দ্রের উপর তুমি প্রভাব বিস্তার করতে চাও!

অধর্ম। হ্যাঁ চাই। এই অযোধ্যায় চলবে আমার বিজয় শকট। এখনেই হবে অধর্ম আর কুমতির লীলাক্ষেত্র। ধর্মপ্রাণ হরিশ্চন্দ্রকে হতে হবে আমার ক্রীতদাস।

ধর্ম। এত আশা—হরিশ্চন্দ্রকে তোমার ক্রীতদাস করতে চাও!

অধর্ম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চাই—চাই—

ধর্ম। বেশ—চেষ্টা করে দেখ, আমি তোমার প্রস্তাব মেনে নিলাম। ছদ্মবেশে আশ্রয় নেবো, কেউ কারও পরিচয় দেব না। তবে একটা কথা জেনে রাখ অধর্ম—

অধর্ম। }
কুমতি। } কি ?

ধর্ম। ধর্ম যাকে বর্মের মত ঘিরে রেখেছে—অধর্মের কালোছায়া কোনদিনই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না—

। প্রস্থান ।

কুমতি। উঃ—অসহ্য—অসহ্য বর্মের এই দম্ভের উক্তি !

অধর্ম। চিন্তা নেই কুমতি, অচিরেই ধর্মের এই দম্ভ আমি ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

কুমতি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। নইলে জানবো—বিধাতা বৃথায় আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

অধর্ম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য আমার ক্রীতদাস।

কুমতি। কুমতিও তোমার লীলা সহচরী। হিংসা, প্রবঞ্চনা, লালসা প্রতারণা, ছলনা আমার ক্রীতদাসী।

অধর্ম। তবে যাও প্রিয়া, প্রথমে দৃষ্টি দাও তুমি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের উপর, আর আমি যাবো হরিশ্চন্দ্রের কাছে। তারপর—

কুমতি। তারপর ?

অধর্ম। তারপর জগৎবাসীকে আমি নূতন করে দীক্ষা দেবো—সে ধর্মের নাম হবে অধর্ম—

[প্রস্থান ।

কুমতি। আমিও জগৎবাসীকে দেখিয়ে দেবো—কে বড়—সুমতি না কুমতি।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম।

দেবানিকের প্রবেশ।

দেবানিক। হায়-হায়-হায়—আজ আর বাঁচার কোন আশা নেই। কি সর্বনাশ, রোজ রোজ আশ্রমের বাগান থেকে ফুল চুরি! এতদিন তবু এ-বাগান ও-বাগান থেকে এনে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়েছি। কিন্তু আজ যে আশে-পাশের কোন বাগানেই ফুল নেই। গুরুদেব স্নান করে এসে যদি পুজোর ফুল না পায়—তাহলে দুম্ করে রেগে গিয়ে ওঁ—হ্রিং—ফট বলবে—অমনি ভট করে তার চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোবে—আর ঝট করে আমি হয়ে যাবো একগাদা ছাই। আরে বাবা—একি আর যে সে ঋষি—স্বয়ং বিশ্বামিত্র—কাঁচা খেকো দেবতা। কথায় কথায় অভিশাপ আর সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম। এই রে—ঐ আসছে!

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। ওঁ ধ্যায়সদা সৌবিত্রী মণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ সরসীজাম সন্নিবিষ্ট—কেয়ূর্বান কনক কুণ্ডলবান—কিরীটাধারী হিরণ্ময় বপুরুক্ত শঙ্খচক্র—[ঊর্দ্ধে প্রণাম]

দেবানিক। গুরুদেব—[সাষ্টাঙ্গে প্রণাম]

বিশ্বামিত্র। দেবানিক, আমার পুজোর আয়োজন করে দে!

দেবানিক। এই মরেছে, ভস্ম হতে আর দেরী নেই দেখছি!

বিশ্বামিত্র। কি হ'ল চুপ করে আছিস কেন, যা—

দেবানিক। অভিশাপ দিন গুরুদেব—ঐ ব্যাটাদের অভিশাপ দিন।

বিশ্বামিত্র। কাকে অভিশাপ দেবো—কি হয়েছে?

দেবানিক। সর্বনাশ হয়ে গেছে গুরুদেব !

বিশ্বামিত্র। কি সর্বনাশ হয়েছে ?

দেবানিক। ভয়ানক সর্বনাশ হয়েছে—ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হয়েছে ! সে কথা বলতে আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে !

বিশ্বামিত্র। দেবানিক—

দেবানিক। গুরুদেব, আমাদের বাগানের ফু—ওরে বাবা—কি করে সেকথা বলবো !

বিশ্বামিত্র। শীঘ্র বল কি হয়েছে, নইলে তোকে আমি—

দেবানিক। দোহাই গুরুদেব, আমার উপর নির্দয় হবেন না। আমি একেবারে অবলা গো-বেচরা, আমি কিছুই জানি না।

বিশ্বামিত্র। কি জানিস না ?

দেবানিক। কোন ব্যাটা যেন আমাদের বাগানের ফুল চুরি করে নিয়ে গেছে !

বিশ্বামিত্র। কি—ফুল চুরি করে নিয়ে গেছে !

দেবানিক। হ্যাঁ গুরুদেব, বাগানে একটাও ফুল নেই।

বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে ফুল চুরি !

দেবানিক। শুধু আজ নয় গুরুদেব, অনেকদিন ধরেই এই চুরি চলছে। এতদিন অন্যান্য বাগান থেকে ফুল এনে দিয়েছি। কিন্তু আজ আর কোন বাগানেই ফুল নেই।

বিশ্বামিত্র। এতদিন একথা বলনি কেন মূর্খ ?

দেবানিক। আজ্ঞে—ভয়ে—

বিশ্বামিত্র। অপদার্থ।

দেবানিক। ঠিক বলেছেন গুরুদেব, শুধু আমি একা নই—আমার বাপ-চোদ্দপুরুষ যে যেখানে আছে সবাই অপদার্থ।

বিশ্বামিত্র। থামো!

দেবানিক। থামলাম।

বিশ্বামিত্র। আমার আশ্রমে ফুলচুরি! আমার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা!

দেবানিক। কি বলবো গুরুদেব, আপনি নেহাৎ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ—তাই এখনও চুপ করে আছেন। আমি যদি আপনার মত সাধন-ভজন জানতাম—তাহলে ব্যাটাদের একহাত দেখে নিতাম।

বিশ্বামিত্র। কিন্তু কে সেই অপরিণামদর্শী, কার এত স্পর্ধা! জানে না সে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে, জানে না সে কার আশ্রমের ফুল চুরি করেছে!

দেবানিক। না জানলেও এবার জানিয়ে দিন গুরুদেব। ধ্যান করে দেখুন কোন ব্যাটা ফুল চুরি করেছে। তারপর ওঁ রিং ফট বলে একটা অভিশাপ দিন—সঙ্গে সঙ্গে ছাইগাদা।

বিশ্বামিত্র। হ্যা-হ্যা, শাস্তি দিতে হবে, অন্যায়ের শাস্তি দিতে হবে। যে সেই চোর হোক না কেন— যেখানেই থাকুক না কেন—এই বিশ্বামিত্রের অভিশাপে—

কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। শান্ত হও ঋষি, অভিশাপ দিয়ে তুমি তাদের ভস্ম করতে পারবে না।

বিশ্বামিত্র। কে তুমি নারী—বিশ্বামিত্রের কাজে বাধা দিতে এসেছো?

কুমতি। আমি—আমি—

দেবানিক। আমি বলে আর ঢং করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না—

কেটে পড়—কেটে পড়। গুরুদেবের এখন মন-মেজাজ ভালো নয়, হয়তো ফট করে তোমাকেই—

কুমতি। আমাকে ভস্ম করার ক্ষমতা তোমাদের গুরুদেবের নেই।

বিশ্বামিত্র। কি—এতবড় কথা বলতে তোমার সাহস হ'ল! জানো না তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে আছো! জানো না রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তপের প্রভাব!

দেবানিক। ওঁ হ্রিং ফট বলে অভিশাপটা দিয়ে দিন না গুরুদেব, তাহলেই বুঝবে কত ধানে কত চাল।

কুমতি। কোন লাভ হবে না, আমি যে অমর।

বিশ্বামিত্র। অমর! সত্যি করে বল—কে তুমি বালিকা?

কুমতি। আমি দেবী।

উভয়ে। দেবী!

কুমতি। নাম আমার সুমতি।

বিশ্বামিত্র। ধর্মের সহ-ধর্মিণী তুমিই দেবী সুমতি?

দেবানিক। আমি আগেই ভেবেছিলাম গুরুদেব, এই মেয়েছেলে দেবী না হয়ে যায় না।

বিশ্বামিত্র। আঃ—দেবানিক—

দেবানিক। রাগ করবেন না গুরুদেব, একটু মাথা ঠাণ্ডা করে দেবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। নইলে দেবী হয়তো মনে মনে রাগ করবে আর ভাববে—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ভীষণ অভদ্র। যাক, এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম—

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। বল দেবী, দেবলোক ছেড়ে বিশ্বামিত্রের এই তপোবনে—

কুমতি। তোমারই মঙ্গলের জন্যে এসেছি ঋষি।

বিশ্বামিত্র। দেবী—

কুমতি। জানো রাজর্ষি, রোজ রোজ কারা তোমার বাগনের ফুল চুরি করে নিয়ে যায় ?

বিশ্বামিত্র। কারা ?

কুমতি। তারাও দেবী। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রতীক, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শক্তির উৎস শক্তিরূপা তিন নারী। আর দেবতারাই তাদের এই কাজের ইন্ধন যোগাচ্ছে।

বিশ্বামিত্র। কি—দেবতা হয়ে ব্রাহ্মণের সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে ইন্ধন যোগাচ্ছে !

কুমতি। আমি তাদের এই হীন কাজে বাধা দিয়েছিলাম, তাই তাদের সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব বেধেছে। তারা বলে, বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলেই আমরা স্বীকার করি না।

বিশ্বামিত্র। কি বললে—কি বললে দেবী, দেবতারা আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে না ! যে বিশ্বামিত্র রাজ-ঐশ্বর্য, রাজভোগ, রাজ-সুখ বিসর্জন দিয়ে সাধন-ভজনে নিজের আশ্রমে পড়ে আছে, যে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্বের আশায় কখনও উর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে—কখনও বা চারিদিকে অগ্নি-কুণ্ড জেলে কৃচ্ছ তপস্যা করেছে, মহর্ষি বশিষ্ঠ যাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন—দেবতারা তাকে অস্বীকার করে !

কুমতি। শুধু কি তাই—তারা আরও বলে, সাধনায় বসে উর্ব্বশীকে দেখে তুমি নাকি চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছিলে। কুকুরের মাংস খেয়েছিলে। জহ্লাদের মত বশিষ্ট মুনির একশো ছেলেকে হত্যা করেছিলে। তাই বশিষ্ট তোমাকে উন্মাদ মনে করে ব্রাহ্মণ বলে তোমাকে ভুলিয়েছে—আসলে তুমি নাকি ব্রাহ্মণ নও।

বিশ্বামিত্র। অসম্ভব। ব্রহ্মাই আমাকে বলেছেন, বশিষ্ট যদি আমাকে

ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেন—তবেই আমি ব্রাহ্মণ। তাইতো বশিষ্ঠের শত পুত্র বধের পর আমি যখন বশিষ্ঠমেধ যজ্ঞ করলাম তখন তিনি আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেছেন। আমি জানি, মহর্ষি বশিষ্ঠ কখনও আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না।

কুমতি। তবু তো তেত্রিশ-কোটি দেবতা চক্রান্ত করে তোমার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। বলছে—বশিষ্ঠ আর তুমি আকাশ পাতাল প্রভেদ। বশিষ্ঠ প্রকৃত ব্রাহ্মণ—আর তুমি—

বিশ্বামিত্র। আমিও ব্রাহ্মণ। শুধু দেবতা কেন—দেবতা, দানব, মানব, ধাতার সমগ্র সৃষ্টি অস্বীকার করলেও আমি জানি—সাধনার বলে আজ আমি পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ।

কুমতি। আমিও তো তাই জানি। তাইতো দেবতাদের বারংবার বলেছি—বিশ্বামিত্রের সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করো না। কিন্তু তারা আমার কথা উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছে—আমাকে অপমান করেছে।

বিশ্বামিত্র। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—দেবতাদের মনেও এত শঠতা—এত কপটতা! সংসারে সহস্র বাঁধনের মধ্যে থেকেও মানুষ যে দেবতাদের নাম করে একটু শান্তি পেতে চায়, যে দেবতাদের করুণা লাভের আশায় মানুষ জীবনের সুখ-শান্তি ঐশ্বর্য-বৈভব বিসর্জন দিয়ে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়, সেই দেবতারা—

কুমতি। তোমাকে হিংসা করে। তুমি চণ্ডালের যাজক ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠিয়েছো। এবার যদি তুমি নিজেই দেবতার আসন লাভ করে স্বর্গে যাও, তাই—

বিশ্বামিত্র। জাগছে—জাগছে—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ক্রোধানল জাগছে।

কুমতি। জাগো রাজর্ষি—জাগো। যে সাধনার বলে তুমি ক্ষত্রিয়

থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো, ইচ্ছা করলে সেই সাধনার বলে তুমি ভগবান হতে পার।

বিশ্বামিত্র। ভগবান হতে পারি! কেমন করে?

কুমতি। ত্রিবিদ্যা সাধন করে।

বিশ্বামিত্র। ত্রিবিদ্যা সাধন!

কুমতি। তবে শোন ঋষি, ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ্বরের শক্তির মূলাধার, সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয়ের প্রতীক যে তিন নারী তোমার আশ্রমের ফুল চুরি করে নিয়ে যায়,—তুমি তোমার মন্ত্রশক্তি দিয়ে তাদের বন্দী করে ত্রিবিদ্যা সাধন কর। তাহলেই দেখবে—তাদের সমস্ত শক্তি হরণ করে তুমিই হবে সর্বশক্তিমান—তুমিই হবে ভগবান।

বিশ্বামিত্র। ত্রিবিদ্যা সাধন—ত্রিবিদ্যা সাধন,—তুমি ঠিক বলেছো সুমতি দেবী। তোমার কথামত আমি ত্রিবিদ্যা সাধনে ব্রতী হব ভগবানকে শক্তিহীন করে আমিই হব সর্বশক্তিমান ভগবান।

দেবদূতের প্রবেশ।

দেবদূত। ভুল—ভুল ঋষি, এ তোমার আকাশ-কুসুম কল্পনা। কল্পনাই থেকে যাবে—বাস্তবে কোনদিন পরিণত হবে না।

বিশ্বামিত্র। কে তুমি আগন্তুক, বিশ্বামিত্রকে ভগ্নোৎসাহ করতে এসেছ?

দেবদূত। আমি দেবদূত।

বিশ্বামিত্র। দেবদূত! কি বলতে চাও তুমি?

দেবদূত। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মূলাধার যিনি—তিনিই একমাত্র ভগবান। তুমি ঋষি—ঋষিই থাকবে, ভগবান কোনদিনই হতে পারবে না।

বিশ্বামিত্র। পারি কি না আমি জগৎবাসীকে দেখিয়ে দেব। আগে ত্রিবিদ্যা সাধনা করেনি, তারপর—

দেবদূত। ব্যর্থ হবে তোমার সে সাধনা ঋষি। যা কোনদিন হয়নি—হবে না—হতে পারে না—কেন তুমি সেই মরীচিকার পিছনে ছুটে যাচ্ছো ?

বিশ্বামিত্র। আগন্তুক—

দেবদূত।—

গীত।

ভুল করো না ঋষি, ভুল করো না—
ছল করে ও জাল পেতেছে, ফাঁদে পড়ো না।
ব্রহ্ম জেনে ব্রাহ্মণ তুমি
কেন ভূমা ত্যজি চাহ ভূমি ?
মতিভ্রমি কেন ঋষি হবে হীনমনা।
(ওযে) মরীচিকার মোহন-মায়া
আনবে ডেকে বিপদ-ছায়া
জয়ের আশায় ছুটলে পরে হবে বিড়ম্বনা॥

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। তাইতো—তাইতো—গীতিচ্ছলে কি বলে গেল ঐ আগন্তুক! তবে কি—তবে কি—

কুমতি। কি হ'ল, ওর কথায় ভেঙ্গে পড়লে নাকি ঋষি ? শুনলে না—ওর নাম দেবদূত ? মানে দেবতাদের দূত। দেবতারাই ওকে পাঠিয়েছে—যাতে তুমি ত্রিবিদ্যা সাধন না কর।

বিশ্বামিত্র। না-না, ত্রিবিদ্যা সাধন আমাকে করতেই হবে। আগামী পূর্ণিমা তিথিতে হবে সেই পুণ্যময় শুভলগ্ন। তারপর হব আমি ভগবান।

কুমতি। এই তো রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের উপযুক্ত কথা।

বিশ্বামিত্র। জাগো—জাগো ব্রাহ্মণ্যদেব, তুমি আমার সাধনায় সহায় হও। আমাকে সিদ্ধিকাম কর—সিদ্ধিকাম কর— [প্রস্থান।

কুমতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ক্ষেপিয়ে দিয়েছি—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছি। ওদিকে আমার স্বামী অধম রাজা-হরিশ্চন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এইবার আমাদের আশা পূর্ণ হবেই।

দেবানিকের প্রবেশ।

দেবানিক। বলি ও সগ্গের দেবী, শুনছো ?

কুমতি। আমাকে বলছো ?

দেবানিক। তোমাকে নয়তো কি শ্যাওড়া গাছের পেত্নীকে বলছি ?

কুমতি। কি বলছো—বল ?

দেবানিক। ওঃ—খুব যে গরম দেখাচ্ছো! বলি তুমি নাকি আমাদের গুরুদেবকে ভগবান হওয়ার যুক্তি দিয়েছো ?

কুমতি। হ্যাঁ দিয়েছি, তাতে তোমারও লাভ হবে।

দেবানিক। আমার আবার কিসের লাভ!

কুমতি। তুমি যখন গুরুর চেলা, তখন তুমিও একজন ছোটোখাটো ভগবান হয়ে যাবে।

দেবানিক। আরে দূর—মানুষ কখনও ভগবান হয় ?

কুমতি। হয়-হয়, সাধনার জোর থাকলে নিশ্চয়ই হয়।

দেবানিক। আরে গুরুদেব যদি ভগবান হয়—তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কি করবে ?

কুমতি। তারা তখন অকেজো হয়ে যাবে।

দেবানিক। ধ্যেৎ—তুমি গাঁজা-টাঁজা খাও নাকি ?

কুমতি। কি বললে— !

দেবানিক। থুড়ি—ভুলেই গেছিলাম তুমি মেয়েছেলে।

কুমতি। তার উপর দেবী।

দেবানিক। তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু গুরুদেব এখন ভগবান হওয়ার আশায় ক্ষেপে গিয়ে আমাকে হুকুম করেছে—যেখান থেকে পারো মণ মণ গাওয়া ঘি, রাশি রাশি বেলকাঠ, চন্দনকাঠ, আমের পল্লব, বেলপাতা হাজির কর। এসব কি করে হবে শুনি ?

কুমতি। তুমি যখন গুরুর উপযুক্ত চেলা রয়েছো, তখন ঠিক হয়ে যাবে।

দেবানিক। ছাই হবে—ঘোড়ার ডিম হবে—অষ্টরম্ভা হবে। তার চেয়ে তুমি গুরুদেবকে বল—ও আশা মন থেকে ছেড়ে দিক, ভগবান টগবান হয়ে কাজ নেই।

কুমতি। তাই কখনও হয়! ভগবান তাকে হতেই হবে। আর তোমাকেও—[কটাক্ষ হানে]

দেবানিক। তার শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে হবে। ওকি—আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছো কেন ?

কুমতি। তোমাকে দেখতে আমার খুব ভালো লাগছে, তাই দেখছি।

দেবানিক। তোমার মাথা-টাথা খারাপ নাকি!

কুমতি। না-না, সত্যিই তুমি খুব সুন্দর।

দেবানিক। তোমার চোখে ছানি টানি পড়েনি তো ?

কুমতি। ও কথা বলছো কেন ঋষি কুমার।

দেবানিক। আমার এই হাড় জিরজিরে—গড়া কাঠের মত চেহারা যদি সুন্দর দেখতে হয়, তাহলে খারাপ দেখতে কে—মহারাজা হরিশ্চন্দ্র ?

কুমতি। তা বললে কি হয়,—আমার চোখে তুমি খুব সুন্দর। তাইতো তোমাকে প্রথম নজরেই আমি মনে মনে ভালবেসে ফেলেছি।

দেবানিক। হরিহে মাধব—স্নান করবো না গা ধোব।

কুমতি। প্রিয়—প্রিয়তম, কোথায় যাচ্ছো ? [জড়িয়ে ধরে]

দেবানিক। ছাড়ো—ছাড়ো, আমার শরীরের মধ্যে আগুন জলছে, মাথা ঝিম ঝিম করছে, চোখে অন্ধকার দেখছি।

কুমতি। আঃ—কেন তুমি অমন করছো ? আমি যে তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। চলনা—ফুল বাগানের আড়ালে বসে আমরা দুজনে প্রেম করি ?

দেবানিক। প্রেম কি জিনিষ—খাই না মাথায় দেয় ?

কুমতি। ঠাট্টা করছো !

দেবানিক। ধরে ফেলেছো দেখছি। তাহলে শোন একটা সত্যি কথাই বলছি,—আগে তোমাকে দেখে দেবী বলেই ভেবেছিলাম, এখন তোমার কথা শুনে আর কাণ্ড কারখানা দেখে মনে হচ্ছে তুমি—তুমি একটা—

কুমতি। আমি—কি—

দেবানিক। তুমি একটা ইয়ে—মানে—যাচ্ছেতাই—

[প্রস্থান।

কুমতি। হুঃ—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে যে টলিয়ে দিল, সামান্য একটা ঋষি কুমারের কাছে সে হার মেনে গেল ! না—না—হার মানলে চলবে না, আমি যে অধর্মের স্ত্রী—কুমতি—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদ।

মহেন্দ্র ও বিক্রমজিৎ-রূপী অধর্মের প্রবেশ।

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাসালে বন্ধু, সত্যিই তুমি আমাকে হাসালে।

মহেন্দ্র। না-না—হাসির কথা নয় বন্ধু, সত্যিই তুমি ভাগ্যবান।

বিক্রমজিৎ। কি রকম?

মহেন্দ্র। এই দেখ না—আমি সেই কবে থেকে প্রজাদের শুভা-শুভ খবর আনার চাকরী নিয়েছি, কিন্তু কি হ'ল—যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। আর তুমি দুদিন আসতে না আসতেই—

বিক্রমজিৎ। প্রধান সেনাপতি হয়ে গেলাম—এইতো! ভুল—ভুল—এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা বন্ধু।

মহেন্দ্র। ভুল ধারণা!

বিক্রমজিৎ। একশোবার। আমি ওসব ভাগ্য-টাগ্য মানি না, আমি মানি পুরুষকার—মানি বাহুবল আর বুদ্ধি।

মহেন্দ্র। বুদ্ধি—

বিক্রমজিৎ। নিশ্চয়ই। ভাগ্য আপনা হতেই তৈরী হয় না বন্ধু, ভাগ্যকে নিজের কৃতিত্বের দ্বারা তৈরী করতে হয়। যেমন ধর—মানুষ প্রথমে কষ্ট করে। একটু দাঁড়াবার জায়গা করে। তারপর কৌশল করে সেখানে বসে পড়ে এবং আস্তে আস্তে ঘুমোবার জায়গা করে নেয়। কিন্তু যাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই বা ক্ষমতা থাকলেও করতে চেষ্টা করে না—তারাই ভাগ্যের দোহাই দিয়ে পড়ে থাকে—যেমন তুমি।

মহেন্দ্র। আমি!

বিক্রমজিৎ। হ্যাঁ তুমি। তোমার ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলেই উন্নতি করতে পারো। প্রচুর টাকাও উপার্জন করতে পারো, কিন্তু করছো না।

মহেন্দ্র। ইচ্ছা করলেই আমি প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারি! কি করে?

বিক্রমজিৎ। তাহলে শোন—, এ রাজ্যের প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর আনার দায়িত্ব তোমার; মহারাজও তোমাকে ভালবাসেন এবং প্রচুর বিশ্বাস করেন।

মহেন্দ্র। নিশ্চয়ই। মহারাজের সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা আমি কোনদিনও করিনি, তাইতো তিনি আমাকে ভালবাসেন।

বিক্রমজিৎ। এবং গরীব দুঃখী প্রজাদের মাঝে মাঝে তিনি অর্থ দান করেন। সেই টাকা তোমার হাত দিয়েই সেই সব গরীব দুঃখী প্রজাদের হাতে যায়।

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, এই জন্য প্রজারাও আমাকে খুব প্রীতির চোখে দেখে।

বিক্রমজিৎ। প্রীতির চোখে দেখে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—ওসব প্রীতি-ভাল-বাসার কথা ভুলে গিয়ে নিজে একটু গুছিয়ে নিতে চেষ্টা কর, নইলে ভবিষ্যতে ঠকবে।

মহেন্দ্র। তার মানে!

বিক্রমজিৎ। মানে—মহারাজ যে অর্থ তোমার হাতে দিয়ে প্রজাদের বিলি করেন—তার থেকে যদি তুমি অর্ধেক অর্থ নিজের জন্য সরিয়ে রাখো তাহলে—

মহেন্দ্র। কি বলছো বন্ধু, মহারাজ জানতে পারলে যে আমাকে হত্যা করবেন!

বিক্রমজিৎ। একটু বুদ্ধি খরচ করলে জানতে পারবেন কেন? মহারাজ তো আর প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন না!

মহেন্দ্র। কিন্তু যে মহারাজ আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন, অগাধ বিশ্বাস করেন—তাঁর সঙ্গে এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা কি—

বিক্রমজিৎ। আ-হা-হা—আমি তো আমার জন্য কিছু বলছি না বন্ধু, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।

মহেন্দ্র। তাই বলে এত বড় অধর্ম!

বিক্রমজিৎ। অধর্ম—হাঃ-হাঃ-হাঃ—নিজের স্বার্থের জন্যে একটু-আধটু অধর্ম করলে কিছু হয় না। বরং ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য্যে অধর্মের গ্লানি দূর করে দিয়ে জীবনটাকে পরিপূর্ণ আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

মহেন্দ্র। বন্ধু!

বিক্রমজিৎ। মানুষ কি চায়? ভোগ—আনন্দ—উচ্ছাস। তাই যদি না পেলে, তাহলে জীবনের মূল্য কি? আচ্ছা বন্ধু, তোমার কি ইচ্ছা হয় না—একটা বিরাট সাত-মহলা প্রাসাদে তুমি বাস করবে? তোমার কি ইচ্ছা হয় না—বিশ জন সুন্দরী যুবতী তোমার পদসেবা করবে? তোমার স্ত্রীর সারাদেহ অলঙ্কারে ঝলমল করবে? কি হ'ল—কি ভাবছো?

মহেন্দ্র। উঁ—ভাবছি ধর্ম—অধর্ম,অধর্ম—ধর্ম, এ দুইয়ের মধ্যে কাকে আমি গ্রহণ করবো?

বিক্রমজিৎ। অধর্মকে।

মহেন্দ্র। আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও বন্ধু—একটু ভালো করে চিন্তা করতে দাও।

হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। কিসের চিন্তা করছো মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে মহারাজ, আমি—মানে—

বিক্রমজিৎ। প্রজাদের সুখ দুঃখের চিন্তা করছিলো মহারাজ।

হরিশ্চন্দ্র। চিন্তা কর মহেন্দ্র—ভালো করে চিন্তা কর, কিভাবে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা যায়—কিভাবে তাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা যায়।

মহেন্দ্র। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। আমার আবাল্যের স্বপ্ন—অযোধ্যা-নগরীকে আমি এক স্বর্গরাজ্য করে গড়ে তুলবো। এখানে থাকবে না অনাহার—অন্নাভাব, থাকবে না রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু, হবে না অকাল মরণ, থাকবে না পুত্র-শোক জ্বালা—থাকবে শুধু শান্তি আর শান্তি। জানি না এ স্বপ্ন আমার স্বার্থক হবে কিনা।

বিক্রমজিৎ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, আমরাই আপনার এই স্বপ্নকে স্বার্থক করে গড়ে তুলবো।

হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু তবু—তবু যে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না বিক্রমজিৎ!

বিক্রমজিৎ। কেন মহারাজ, আমাদের কাজে কি কোন শৈথিল্যের প্রকাশ পেয়েছেন?

হরিশ্চন্দ্র। না-না তা নয় বিক্রমজিৎ—আমি জানি, আমার সেনাপতি মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি রাজকর্মচারীই অত্যন্ত বিশ্বস্ত। কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন এবং আমার শুভানুধ্যায়ী।

মহেন্দ্র। তবে আপনি এত চিন্তা করছেন কেন মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র। কেন? এই এক বছর ধরে রাজ্যের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতা যে অরাজকতা দেখা দিয়েছে—এ যে আমার স্বপ্নাতীত মহেন্দ্র! প্রতি-দিন রাজসরকারে নানারকম অভিযোগ আসছে। তাইতো মাথায়

আমার চিন্তার পাহাড় চেপে গেছে। চিন্তায় আমার চোখের ঘুম মুখের আহার কেড়ে নিয়েছে।

বিক্রমজিৎ। মহারাজ, হঠাৎ রাজ্যের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে সত্য, দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তার জন্য আপনি এতটা উতলা হবেন না।

হরিশ্চন্দ্র। উতলা হবো না! বল কি সেনাপতি! আমি যে রাজা—প্রজাদের সুখে শান্তিতে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েই যে আমি সিংহাসনে বসেছি! তাইতো তারা যখন হাসে তখন মনে হয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমার মাথায় ঝরে পড়ে। কিন্তু তারা যখন কাঁদে তখন মনে হয় ঐ সব প্রজারাই শত সহস্র কণ্ঠে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে, আমার ধ্বংস কামনা করছে।

মহেন্দ্র। এ আপনার ভুল ধারণা মহারাজ, প্রজারা আপনার ধ্বংস কামনা করে না, বরং ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। আপনার মত দানবীর কর্ম্মবীর রাজা পেয়ে প্রজারা নিজেদের ধন্য বলে মনে করে।

হরিশ্চন্দ্র। জানি না প্রজাদের এই ভক্তি শ্রদ্ধার মর্যাদা আমি শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবো কিনা।

বিক্রমজিৎ। নিশ্চয়ই পারবেন মহারাজ, আমরা আপনার উপর সে বিশ্বাস রাখি।

হরিশ্চন্দ্র। মহেন্দ্র—

মহেন্দ্র। আদেশ করুন মহারাজ।

হরিশ্চন্দ্র। রাজ্যের পশ্চিম সীমানা থেকে যে সব দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের সংবাদ তুমি এনেছো—তাদের সাহায্য করতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে সাহায্য কর! যত অর্থ লাগে রাজকোষ থেকে নিয়ে যাও।

মহেন্দ্র। কিন্তু মহারাজ, আপনার অনুমতি ছাড়া—

হরিশ্চন্দ্র। আমি অর্থ সচিবকে বলে দিয়েছি, তুমি তার কাছে গেলেই তিনি তোমাকে অর্থ দিয়ে দেবেন।

মহেন্দ্র। যথা আজ্ঞা মহারাজ, আমি এখুনি যাচ্ছি—[প্রস্থানোদ্যত]

বিক্রমজিৎ। আর সেই সঙ্গে চিন্তা কর বন্ধু, ভালো করে চিন্তা কর—কি করলে ভালো হয়।

মহেন্দ্র। সেকথা আর বলতে হবে না বন্ধু, আমি সব চিন্তা করেই কাজ করবো।　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। [স্বগতঃ] আরও একজন তাহলে হাতের মুঠোয় এলো।

হরিশ্চন্দ্র। বিক্রমজিৎ—

বিক্রমজিৎ। মহারাজ, মহেন্দ্রকে আপনি খুব বিশ্বাস করেন, তাই না?

হরিশ্চন্দ্র। একা মহেন্দ্র কেন বিক্রমজিৎ, তোমাদের সবাইকেই আমি সমানভাবে বিশ্বাস করি, সমান চোখে দেখি। কারণ, তোমরাই যে আমার রাজ্যের এক একটা শক্তির স্তম্ভ, আমার সুদিনের সাথী—দুর্দিনের বন্ধু। তোমাদের অবিশ্বাস করলে কি রাজকার্য পরিচালনা করা যায়!

রাঘব রায়ের প্রবেশ।

রাঘব। মহারাজ কোথায়—মহারাজ! এই যে মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। কি হয়েছে মহামন্ত্রী, আপনাকে এত চঞ্চল বলে মনে হচ্ছে কেন?

রাঘব। চঞ্চল হব না! যে দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি—

হরিশ্চন্দ্র। দুঃসংবাদ!

রাঘব। হ্যাঁ মহারাজ, কিছুক্ষণ আগে একদল ব্রাহ্মণ এসে আমার কাছে দুঃসংবাদ দিয়ে গেছে।

হরিশ্চন্দ্র। কি দুঃসংবাদ মহামন্ত্রী ?

রাঘব। একদল দুষ্কৃতকারী অযোধ্যার পাণ্ডা নিবাসে হানা দিয়ে ব্রাহ্মণদের পূজা অর্চনায় বাধা সৃষ্টি করেছিলো।

হরিশ্চন্দ্র। সেকি !

রাঘব। শুধু তাই নয় মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে পূজো করছিল বলে দুষ্কৃতকারীরা সেই ব্রাহ্মণদের বেত্রাঘাত করেছে।

হরিশ্চন্দ্র। কি বললেন—কি বললেন মহামন্ত্রী, আমি শুনতে ভুল করিনি তো ! আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণের গায়ে বেত্রাঘাত—পূজার্চনায় বাধা সৃষ্টি করা !

রাঘব। এমন কি তারা পান্থনিবাসও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে।

হরিশ্চন্দ্র। বজ্র—এখনও তুমি নীরব আছো—এখনও তুমি আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়োনি !

বিক্রমজিৎ। মহারাজ—মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। দেখতো—দেখতো সেনাপতি, পৃথিবীতে ভূমিকম্প হচ্ছে কিনা, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিনা ?

বিক্রমজিৎ। শান্ত হোন মহারাজ—আপনি শান্ত হোন।

হরিশ্চন্দ্র। শান্ত হব—আমি শান্ত হব—এত বড় দুঃসংবাদ শুনেও আমি শান্ত হব ! বলতে পারো—বলতে পারো সেনাপতি, বলতে পারেন মহামন্ত্রী—আমি মরে গেছি না বেঁচে আছি ? আমি সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র—না তার প্রেতাত্মা ?

বিক্রমজিৎ। অধৈর্য হবেন না মহারাজ, আমি কথা দিচ্ছি—যারাই সেই দুষ্কৃতকারী হোক না কেন—এক পক্ষকালের মধ্যে তাদের সন্ধান করে আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত করবো।

রাঘব। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। যান মহামন্ত্রী, এখুনি রাজকোষ থেকে অর্থ দিয়ে বিশজন রাজকর্ম্মচারীকে পান্থনিবাস সংস্কারের জন্য পাঠিয়ে দিন।

রাঘব। অপরাধ নেবেন না মহারাজ, আপনার অনুমতি না নিয়ে সে ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি।

কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। মহারাজের জয় হোক।

হরিশ্চন্দ্র। কে তুমি বালিকা?

কুমতি। মহারাজ, আমি মহর্ষি কৌশিকের মেয়ে—নাম গায়ত্রী। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমের পাশেই আমাদের কুটীর।

হরিশ্চন্দ্র। বুঝলাম। কিন্তু কি তোমার অনুরোধ?

কুমতি। মহারাজ, আমি বড় দুঃখিনী।

হরিশ্চন্দ্র। কি তোমার দুঃখ বালিকা?

কুমতি। কিছুদিন আগে আমার পিতা আমাকে ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছেন। তাই—

রাঘব। বুঝেছি—তুমি নিরাশ্রয়, মহারাজের কাছে আশ্রয়ের জন্য এসেছো—এইতো?

কুমতি। না-না, আমি আশ্রয় নিতে আসিনি।

রাঘব। তবে কেন এসেছো—তাই বল।

কুমতি। মহারাজ, আগামী কাল আমার পিতৃশ্রাদ্ধ। পিতা আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়ে বলেছেন, যদি ধর্মপ্রাণ মহারাজকে কুটীরে এনে আহার করাতে পারি তবেই তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে। তাই আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

হরিশ্চন্দ্র। নিমন্ত্রণ—

রাঘব। মহারাজের হয়ে আমিই তোমাকে বলে দিচ্ছি, উনি ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারবেন না।

বিক্রমজিৎ। আ-হা-হা—মহারাজ যখন উপস্থিত আছেন তখন কথাট তাঁকেই বলতে দিন না মহামন্ত্রী।

কুমতি। মহারাজ, পিতার আত্মার তৃপ্তির জন্যে আমি বড় আশ করে আপনার কাছে এসেছি; সে আশা কি আমার ব্যর্থ হবে! বলুন মহারাজ—বলুন, চুপ করে আছেন কেন—বলুন?

রাঘব। আঃ—কেন বিরক্ত করছো! বলেছি তো উনি যেতে পারবেন না। উনি এখন রাজকার্য নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তুমি যাও।

কুমতি। বেশ—আমি ফিরেই যাচ্ছি। হ'ল না পিতা—হ'ল না, তোমার আত্মার তৃপ্তি হ'ল না। চিরদিন শুনে এসেছি—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রার্থীকে কোনদিন বিমুখ করেননি, কিন্তু তিনিই আজ আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

হরিশ্চন্দ্র। দাঁড়াও বালিকা, তোমাকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে না।

রাঘব। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। কাল ঠিক সময়ে আমি তোমার গৃহে গিয়ে আহার্য গ্রহণ করবো।

কুমতি। আমি ধন্য—আমি ধন্য।

রাঘব। কি বলছেন মহারাজ, আপনি ওর গৃহে আহার করবেন!

হরিশ্চন্দ্র। নইলে যে ব্রাহ্মণের আত্মার তৃপ্তি হবে না। তা ছাড়া ও যে আমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছে মহামন্ত্রী, ওকে কি আমি নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে পারি!

রাঘব। বুঝলাম, আপনার রাজা না হয়ে রাখাল হওয়া উচিত ছিল— [প্রস্থান।

কুমতি। আমি এখন আসি মহারাজ। আপনার এই কৃতজ্ঞতার কথা আমি কোনদিন ভুলব না—

[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। মহারাজ, যদি অনুমতি করেন তাহলে কাল আমি আপনার সঙ্গে দেহরক্ষী হয়ে যেতে চাই।

হরিশ্চন্দ্র। দেহরক্ষী হয়ে! কেন?

বিক্রমজিৎ। পথে যদি কোন শত্রু—

হরিশ্চন্দ্র। না-না, আমার কোন শত্রু নেই বিক্রমজিৎ; তাই দেহরক্ষীরও প্রয়োজন নেই। আমি একাই যাবো।

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। কোথায় যাবে মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র। এই যে শৈব্যা, কিছুক্ষণ আগে এক ঋষি কন্যা এসেছিলো তার পিতার আত্মার তৃপ্তির জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করতে। তাই কাল আমি সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব।

শৈব্যা। না-না মহারাজ, এই এক পক্ষকালের মধ্যে তোমার কোথাও যাওয়া হবে না।

হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি রানী।

শৈব্যা। কথা দিয়েছো! তাহলে তো আর কোন উপায় নেই।

হরিশ্চন্দ্র। কেন—কি হয়েছে রানী?

শৈব্যা। সেকথা চিন্তা করলে ভয়ে এখনও আমার বুকখানা কেঁপে উঠছে, কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারছি না।

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা—

শৈব্যা। কাল রাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছি—

হরিশ্চন্দ্র। স্বপ্ন!

শৈব্যা। হ্যাঁ মহারাজ, দুঃস্বপ্ন। আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে আমি দেখলাম—অযোধ্যায় আগুন জ্বলছে, রাজপথে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, রাজ-প্রাসাদ শয়তানের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, আর এক রক্ত-নেত্র সন্ন্যাসী তোমার দিকে তাকিয়ে বিকট ভাবে হাসছে।

হরিশ্চন্দ্র। কি বলছো রানী!

শৈব্যা। আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলাম। এমন সময়ে দেখলাম এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি আমাকে বললেন—, শৈব্যা, যদি স্বামী-পুত্রের মঙ্গল চাস—তবে এই পক্ষ-কালের মধ্যে মহারাজকে কোথাও যেতে দিবি না। তাহলে ঘোর অমঙ্গল হবে। এই কথা বলে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ অদৃশ্য হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও ঘুম ভেঙ্গে গেল।

হরিশ্চন্দ্র। সব শুনলাম—সব বুঝলাম রানী। তবু কথা যখন দিয়েছি—তখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমাকে যেতেই হবে।

সত্যসন্ধের প্রবেশ।

সত্যসন্ধ। না মহারাজ, এ সঙ্কল্প আপনি ত্যাগ করুন।

হরিশ্চন্দ্র। সত্যসন্ধ—

সত্যসন্ধ। মহারাজ, আপনার মঙ্গলার্থে আমি মন্দিরে পূজো দিতে গিয়ে দেখলাম—নারায়ণ বিগ্রহ ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে আর তার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

হরিশ্চন্দ্র। সে কি—নারায়ণ বিগ্রহের চোখে জল?

বিক্রমজিৎ। না-না মহারাজ, এ হতে পারে না। নিশ্চয়ই সত্যসন্ধের দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে।

সত্যসন্ধ। বিশ্বাস করুন মহারাজ, এ আমার দৃষ্টি বিভ্রম নয়, আমি যা বলছি—সম্পূর্ণ সত্যি। তাই আমার অনুরোধ—এই পক্ষকালের মধ্যে আপনি কোথাও যাবেন না।

হরিশ্চন্দ্র। সত্যসন্ধ, আমি—

বিক্রমজিৎ। সেই ব্রাহ্মণ কন্যাকে কথা দিয়েছেন।

সত্যসন্ধ। কথা শুনুন মহারাজ—কথা শুনুন, এ সবই অশুভ ইঙ্গিত—অমঙ্গলের লক্ষণ।

হরিশ্চন্দ্র। অমঙ্গল! যে হরিশ্চন্দ্র চিরদিন ধর্ম পথে চলে এসেছে, ব্রাহ্মণকে মাথার মণি করে রেখেছে—সেই হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে আজ ব্রাহ্মণের গায়ে বেত্রাঘাত হয়েছে, ধর্মের অপমান করেছে—, এর চেয়েও অমঙ্গলের আর কিছু আছে!

শৈব্যা। বল কি রাজা, একথা সত্যি!

হরিশ্চন্দ্র। এর এক বিন্দুও মিথ্যে নয় রানী।

সত্যসন্ধ। মহারাজ, আমি আপনার পুরোহিত, আপনার হিত কামনাই আমি করি। তাই—

বিক্রমজিৎ। তাই মহারাজকে সত্য ভঙ্গ করিয়ে মিথ্যেবাদী সাজাতে চাও।

সত্যসন্ধ। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। না-না সত্যসন্ধ, তা হয় না। সে আমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছিল, আমি তাকে কথা দিয়েছি, যেতে আমাকে হবেই। নইলে যে ব্রাহ্মণের আত্মার তৃপ্তি হবে না। আর—

বিক্রমজিৎ। জগতের কাছে আপনি মিথ্যাবাদী হয়ে যাবেন।

শৈব্যা। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। বল রানী, তুমি কি চাও আমি সত্যভ্রষ্ট হয়ে মিথ্যাবাদী হই ?

শৈব্যা। না মহারাজ, তা আমি চাই না। আমি যে তোমার "স্ত্রী—সহধর্মিণী"। তোমার যে ধর্ম—আমারও সেই ধর্ম—আমি কি তোমাকে তোমার সত্যধর্ম পালনে বাধা দিতে পারি !

হরিশ্চন্দ্র। এই তো চাই—এই তো সহধর্মিণীর উপযুক্ত কথা।

সত্যসন্ধ। কিন্তু মহারাজ, যদি এই নিমন্ত্রণকে কেন্দ্র করে আপনার বিপদ আসে ?

হরিশ্চন্দ্র। ধর্মকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে হাসিমুখে সেই বিপদকে বরণ করবো।

সত্যসন্ধ। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। আসুক ঝঞ্ঝা—টলুক পৃথিবী, তবু বিপদের ভয়ে সতভ্রষ্ট হয়ে ধর্মের অসম্মান আমি কোনদিন করতে পারবো না। [প্রস্থান।

সত্যসন্ধ। মহারাজ—মহারাজ, রানীমা, আপনি একটু মহারাজকে বুঝিয়ে বলুন।

শৈব্যা। তা হয় না সত্যসন্ধ, তাহলে যে ধর্মের অসম্মান হবে।

সত্যসন্ধ। রানীমা—

শৈব্যা। কিন্তু তবু কেন সেই অশুভ স্বপ্ন দেখলাম, আর কেনই বা মহারাজের নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা শুনে অজানা আশঙ্কায় আমার বুকখানা এমন করে কেঁপে উঠছে !

দেবদূতের প্রবেশ।

দেবদূত। ভয় করছে ? ভয় নেই মা—ভয় নেই। বুক কাঁপলেও

মনটা যেন না কাঁপে। ধর্মের রশি দিয়ে তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখো, তাহলেই ভয়কে জয় করতে পারবে।

শৈব্যা। কে—কে তুমি ?

দেবদূত। এই দেখ—, আমাকে চিনতে পারলে না! আমি দেবদূত গো—দেবদূত, বাপ মরা ভবঘুরে ছেলে।

বিক্রমজিৎ। কে তোকে প্রাসাদে ঢুকতে দিয়েছে ?

দেবদূত। কেউ দেয়নি।

বিক্রমজিৎ। তবে এলি কি করে ?

দেবদূত। উড়ে এলাম।

বিক্রমজিৎ। যা—বেরিয়ে যা—

দেবদূত। তুমি বড্ড বেরসিক। ছেলে এসেছে মায়ের কাছে, তুমি তাড়িয়ে দিলেই কি আমি যেতে পারি ? কি বল মা ?

বিক্রমজিৎ। সহজে না গেলে আমি তোকে—

শৈব্যা। বিক্রমজিৎ—

বিক্রমজিৎ। রানীমা, একটা ভবঘুরে ছেলের সঙ্গে আপনি—

শৈব্যা। সে বুঝবো আমি।

সত্যসন্ধ। ব্যস—বিষ হারিয়ে একেবারে ঢোঁড়া সাপ।

দেবদূত। কিগো মা, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছো কেন ?

শৈব্যা। তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে, অথচ—

দেবদূত। ঠিক মনে পড়ছে না—এইতো ? পড়বে না—পড়বে না, আমি মনে করিয়ে না দিলে মনে পড়বে না।

শৈব্যা। দেবদূত—

দেবদূত। হ্যাঁ—আমি দেবদূত। নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করে যখন যেখানে খুশী যাই, মানুষ ভয় পেলে তাকে সান্ত্বনা দিই, পথ হারালে পথ দেখায়—

শৈব্যা। কি বলছো তুমি?

দেবদূত।—

গীত।

ধর্ম্ম তো নয় ছোট্ট কথা, মানবতার বর্ম্ম সে যে।
মনের মাঝে ডুব দিয়ে দেখ লুকিয়ে সে মর্ম্মমাঝে।

শৈব্যা। দেবদূত!

পূর্ব গীতাংশ।

সব যদি যায়—যাক চলে যাক,
ধর্ম্মকে ধরে তুই বেঁধে রাখ।
ধর্ম্ম সাথে থাকলে গো মা, জয় হবে তোর সকল কাজে।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। চিনেছি—চিনেছি তোমাকে—তুমিতো সামান্য নও, তুমি যে সেই স্বপ্নে দেখা জ্যোতির্ময় পুরুষ। সত্যসন্ধ ওকে ধর—ওকে ধর—

[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। কি হ'ল সত্যসন্ধরূপী, মহারাজকে আটকে রাখতে পারলে না! বুঝতে পারছো—এ জয় আমার?

সত্যসন্ধ। তুমি মূর্খ—তাই ওকথা বলছো, জয় আমার।

বিক্রমজিৎ। তোমার!

সত্যসন্ধ। একশোবার। ভুলে যাচ্ছো কেন বিক্রমজিৎ, সকলের সব বাধা অতিক্রম করে মহারাজ ধর্ম রক্ষার জন্যেই নিমন্ত্রণে যাবেন।

বিক্রমজিৎ। সত্যসন্ধ—

সত্যসন্ধ। ধর্ম ছিল—ধর্ম আছে—ধর্ম থাকবে। তুমি ক্ষণস্থায়ী আলেয়ার আলো, দপ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে যাবে, কিন্তু প্রদীপের আলোকে কোনদিন ম্লান করতে পারবে না— [প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। পারি কিনা দেখিয়ে দেব। কাজ শুরু হয়েছে—আমার ইচ্ছায় অযোধ্যায় অরাজকতা দেখা দিয়েছে, ব্রাহ্মণের গায়ে বেত্রাঘাত পড়েছে, পান্থনিবাস ধ্বংস হয়েছে—এইবার দেখবো এর শেষ কোথায়। জয়লক্ষ্মী কার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেয়—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

আশ্রম সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। ত্রিবিদ্যা সাধন—ত্রিবিদ্যা সাধন—ত্রিবিদ্যা সাধন। আজ পূর্ণিমা তিথিতে এগিয়ে এসেছে সেই পুণ্যলগ্ন। যে স্বার্থপর দেবতারা আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেনি—কাল থেকে তারাই আমাকে ভগবান বলে স্বীকার করবে। ঐ—ঐ আমার মন্ত্রশক্তিতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রতীক শক্তিরূপা তিন নারী লতাগুল্মে বন্দিনী হয়েছে। দেবানিক—দেবানিক—

দেবানিকের দ্রুত প্রবেশ এবং বিশ্বামিত্রের পায়ে পড়ে।

দেবানিক। গুরুদেব—

বিশ্বামিত্র। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

দেবানিক। আজ্ঞে গুরুদেব, কাল সারারাত ধরে আপনার যজ্ঞের আয়োজন করে শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত হয়েছিল, তাই সকালের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বিশ্বামিত্র। যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ ?

দেবানিক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিশ্বামিত্র। কোন কিছু বাকী নেই তো ?

দেবানিক। আজ্ঞে না। বেল-কাঠ, বেল-পাতা, তুলসী, দুব্বো, ঘি চন্দন, তিল, কলা, আলোচাল, গঙ্গা জল—আপনার শ্রাদ্ধে যা যা লাগবে সে সবই ব্যবস্থা করেছি।

বিশ্বামিত্র। কি বললি—শ্রাদ্ধ !

দেবানিক। থুড়ি—ভুল বলেছি, ত্রিবিদ্যা সাধন। [স্বগতঃ] উঃ—এখুনি হয়েছিল আর কি ?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ—ত্রিবিদ্যা সাধন। ঐ দেখ, যারা প্রতিদিন ফুল চুরি করে আমার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতো—সেই তিন নারী লতা-গুল্মে বন্দিনী হয়ে আছে। সাধনার তরী আমার কূলে এসে পৌঁছেচে। কী আনন্দ—কী আনন্দ !

দেবানিক। আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে গুরুদেব ! কেমন—, আর ফুল চুরি করে নিয়ে গিয়ে আমার এমন শান্তশিষ্ট গুরুদেবকে ক্ষেপিয়ে দিবি ? এখন মজা বোঝ ! কথায় বলে—বারে বারে ঘুঘু তুই খেয়ে যাস ধান, এইবার ফাঁদে পড়ে যাবে তোর প্রাণ।

বিশ্বামিত্র। দেবানিক—

দেবানিক। গুরুদেব—

বিশ্বামিত্র। তুই এখানে প্রহরায় নিযুক্ত থাক, দেখিস ওরা যেন

পালাতে না পারে। আর কেউ যেন এসে ওদের মুক্ত করে না দেয়। আমি স্নান করে এসে সাধনায় বসবো। ঐ তিন নারীর সর্বশক্তি হরণ করে সার্থক করবো আমার ত্রিবিদ্যা সাধন।

[প্রস্থান।

দেবানিক। গুষ্টির পিণ্ডি। ত্রিবিদ্যা সাধন না ছাই বিদ্যা সাধন। মেয়েছেলেকে বেঁধে রেখে সাধনা করা—এ আমার বাবার জন্মেও কোনদিন শুনিনি। এখন দেখছি—সেই মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। [হাই তোলে] আ—আবার ঘুম পাচ্ছে। যাক—গুরুদেব যখন স্নান করতে গেছে, এই ফাঁকে আর একটু ঘুমিয়ে নিই। এই—এই ছুঁড়িরা, পালাতে চেষ্টা করিসনি যেন, তাহলেই—ওঁ—রিং—ফট—আর সঙ্গে সঙ্গেই ভস্ম। [শুয়ে ঘুমুতে থাকে]

দ্রুত কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র মনে করেছে—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রতীককে বন্দিনী করেছে। কিন্তু আমি জানি—তা নয়—, ওরা আমারই সহচরী—আমারই আজ্ঞাবাহী—হিংসা, ছলনা আর লালসা। কোথায় ধর্ম—কোথায় সুমতি—দেখে যাও, কুমতি আজ ঋষির মনও বিভ্রান্ত করে দিয়েছে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[দেবানিকের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, সে তাড়াতাড়ি
কুমতিকে জড়িয়ে ধরে]

দেবানিক। কোথায় পালাবি ছুঁড়ি? গুরুদেব, শিগ্‌গির ছুটে আসুন—পালিয়ে যাচ্ছে। ধরে ফেলেছি—ধরে ফেলেছি—

কুমতি। না-না—পালাবো না প্রিয়তম, তোমাকে ধরা দিতেই তো আমি এখানে এসেছি।

দেবানিক। এ্যাঁ—তু—তু—তু—তুমি! আমি মনে করেছিলাম— [ছেড়ে দেয়]

কুমতি। বন্দিনী। না-না—তারা পালাতে পারেনি। ঐ দেখ—তারা যেমন ছিল তেমনই আছে।

দেবানিক। ঠিক আছে, আমি আশ্রমের মধ্যে যাচ্ছি।

কুমতি। চলে যাচ্ছো কেন প্রিয়তম!

দেবানিক। ধ্যেৎ, তোর প্রিয়তমের নিকুচি করেছে। তোমাকে ছুঁয়ে আমার দেহ অপবিত্র হয়েছে—গা ঘিন ঘিন করছে—থুঃ—ওয়াক থুঃ—থুঃ— [প্রস্থান।

কুমতি। যাক—শাপে বর হয়েছে। এখন ওর এখানে না থাকাই ভালো। কিন্তু মহারাজ এখনও আসছেন না কেন! এদিকে যে ঋষির স্নান করে আসার সময় হ'ল। ঐ তো—মহারাজ এদিকেই আসছে। আগে দেখি কি করে? [এক ধারে আত্ম-গোপন করে]

হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। ঐ তো—ঐ তো রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম। এইতো তাঁর পুষ্পোদ্যান, কিন্তু কই—আশে পাশে তো আর কোন আশ্রম দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় মহর্ষি কৌশিকের আশ্রম? তবে কি আমি প্রতারিত হয়েছি! না-না—তাই বা কি করে সম্ভব! যাই, ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখি—

কুমতি। জিজ্ঞাসা করতে হবে না মহারাজ, আমি নিজেই আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

হরিশ্চন্দ্র। বালিকা, তুমি যে বলেছিলে—ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমের পাশেই তোমাদের আশ্রম! কিন্তু—

কুমতি। আমি মিথ্যা বলিনি মহারাজ, ঐ তো—ঐ দেখুন আমাদের টীর।

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঐ তো কুটীর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ মাগেও তো—তবে—একি আমার দৃষ্টি বিভ্রম—না—আমি ওদিকে লক্ষ্যই রিনি!

কুমতি। কি ভাবছেন মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র। এ্যাঁ—না—কিছু না। চল।

[নেপথ্যে—কে আছো বীর—কে আছো বান্ধব—কে আছো ক্ষত্রিয় —বিপন্না নারীকে উদ্ধার কর]

হরিশ্চন্দ্র। ওকি—কারা আর্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করছে!

কুমতি। দেখুন—দেখুন মহারাজ, তিনজন নারী কেমন লতা-গুল্মে বন্দিনী হয়ে রয়েছে। প্রাণপণে নিজেদের মুক্ত করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

হরিশ্চন্দ্র। তাইতো—তাইতো বটে—

[নেপথ্যে—কেউ কি নেই—কেউ কি নেই এই জগতের বুকে বিপন্না নারীদের উদ্ধার করতে ছুটে আসে!]

হরিশ্চন্দ্র। নির্ভয় হও নারী, বিপন্নকে উদ্ধার করতে হরিশ্চন্দ্র এখনও বেঁচে আছে।

কুমতি। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। বালিকা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ওদের মুক্ত করে দিয়ে এখুনি ফিরে আসছি। [প্রস্থান।

কুমতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—যাও—রাজা যাও, এই জন্তেই তোমাকে এখানে টেনে এনেছি। এইবার যদি একবার তোমাকে কুমতির জালে জড়িয়ে ফেলতে পারি—তাহলেই আমার উদ্দেশ্য ষোল-কলায় পূর্ণ হবে।

হরিশ্চন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ ।

হরিশ্চন্দ্র । মুক্ত করে দিয়েছি—মুক্ত করে দিয়েছি সেই তিন কন্যাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য—, আমি তাদের মুক্ত করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সব হাসতে হাসতে শূন্যে মিলিয়ে গেল কেন !

কুমতি । মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র । চল বালিকা, এইবার আমি প্রস্তুত ।

কুমতি । যাবো, কিন্তু তার আগে বলুন—আমার আশা পূর্ণ হবে তো ?

হরিশ্চন্দ্র । তোমার আশা পূর্ণ করতেই তো আমি এসেছি বালিকা !

কুমতি । জানেন—আমার মনে কি আশা ?

হরিশ্চন্দ্র । জানি—তোমার পিতার আত্মার তৃপ্তি ।

কুমতি । না, আমি চাই—আমার দেহ মনের লালসা কামনার তৃপ্তি ।

হরিশ্চন্দ্র । বালিকা—

কুমতি । রাজসভায় যা বলেছিলাম—সব মিথ্যে, কিন্তু এখন যা বলছি সব সত্যি । সত্যিই আমি আপনাকে আপন করে কাছে পাওয়ার জন্যেই মিথ্যে কথা বলে এখানে টেনে এনেছি ।

হরিশ্চন্দ্র । কি—হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে প্রতারণা !

কুমতি । বলুন, আমার এই আশা আপনি পূর্ণ করবেন ?

হরিশ্চন্দ্র । চুপ কর—চুপ কর বালিকা, একথা শোনাও আমার পাপ ।

কুমতি । কেন মহারাজ, আপনি পুরুষ—আমি নারী, আর সম্ভোগ-ইতো নারী-পুরুষের স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়া, এর মধ্যে পাপ কোথায় ?

হরিশ্চন্দ্র। বল না—বল না বালিকা। নারী শুধু ভোগের সামগ্রী র—নারী-স্নেহ মন্দাকিনীর পূতধারা মমতাময়ী মা। শোকে, দুঃখে, আপদে-পদে শান্তিদায়িনী সহধর্মিণী। রোগের শুশ্রূষায়, ব্যথার উপশমে—সবারূপে নারী—ভগিনী। সেই নারী হয়ে নারী সমাজের মুখে তুমি কলঙ্কের কালি লেপে দিওনা।

কুমতি। ওসব কথা বলে কেন আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন হারাজ? একবার ভালো করে আমার দিকে চেয়ে দেখুন, কামনার আগুন জ্বালা—এই দেহ, রূপ, যৌবন—এ সবই যে আমি আপনার জন্যে সাজিয়ে রেখেছি মহারাজ।

হরিশ্চন্দ্র সাবধান বালিকা, দ্বিতীয়বার ওকথা উচ্চারণ করে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিও না। মনে রেখো—শুধু নারী বলেই তুমি আজ আমার হাতে থেকে নিষ্কৃতি পেলে। নইলে যে অপরাধ তুমি করেছ—তার এক-মাত্র শাস্তি—মৃত্যু।

কুমতি। মৃত্যুই আমাকে দিন মহারাজ, আমি কোন প্রতিবাদ করবো না। কিন্তু তার আগে শুধু একবার—একটিবার আপনার বুকে আমাকে স্থান দিয়ে আমার আশা পূর্ণ করুন—[বুকে পড়তে যায়]

হরিশ্চন্দ্র। দূর হও কালনাগিনী—[প্রস্থানোদ্যত]

কুমতি। যাবেন না মহারাজ, কথা শুনুন—বুঝে দেখুন।

হরিশ্চন্দ্র। বুঝেছি—বুঝেছি নারী, নিশ্চয়ই তুমি কোন মায়াবিনী অথবা ছলনাময়ী। ছলনার জাল বিস্তার করে আমাকে তুমি পাপের পঙ্কিল নরকে নিয়ে যেতে চাও। কিন্তু সে আশা তোমার পূর্ণ হবে না নারী। প্রাণ থাকতে হরিশ্চন্দ্র কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না—পাপের পথেও পা এগিয়ে দেবে না।

[প্রস্থান।

কুমতি। আমিও দেখবো রাজা, তোমার এ দম্ভ আমি ভাঙতে পারি কিনা। [প্রস্থান।

দ্রুত বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। দেবানিক—দেবানিক, আমি স্নান করে এসেছি—আমার পূজোর আয়োজন করে দে। আমি ত্রিবিদ্যা সাধনে বসবো। একি—একি—আমি কি স্বপ্ন দেখছি! আমার কি দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে! কোথায় গেল সেই তিন নারী! কে তাদের মুক্ত করে দিলো!

কুমতির পুনঃ প্রবেশ।

কুমতি। রাজা হরিশ্চন্দ্র।

বিশ্বামিত্র। হরিশ্চন্দ্র!

কুমতি। হাঁ ঋষি। কোথা থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে এসে সে ওদের বাঁধন খুলে দিতে গেল। আমি বাধা দিলাম, তোমার সাধনার কথা খুলে বললাম, তবু সে আমার কথায় কান না দিয়ে ক্ষমতার অহঙ্কারে ওদের মুক্ত করে দিয়ে গেল।

বিশ্বামিত্র। এত সাহস—এত স্পর্দ্ধা, আমার বন্দিনীদের মুক্ত করে দেয়! ওঃ—আমার এত আয়োজন—এত আশা, সব পণ্ড হয়ে গেল! বাণিজ্যের ভরা তরী এক মুহূর্তে অগাধ জলে তলিয়ে গেল! এও কি তবে দেবতাদের চক্রান্ত!

কুমতি। দেবতাদের চক্রান্ত কিনা জানি না, তবে এ ক্ষেত্রে অপরাধী কিন্তু হরিশ্চন্দ্র।

বিশ্বামিত্র। হরিশ্চন্দ্র—হরিশ্চন্দ্র—হরিশ্চন্দ্র, তুমি ঠিক বলছো দেবী—অপরাধী হরিশ্চন্দ্র, সেই আমার আশার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। তাকে আমি—তাকে আমি—

দেবানিকের প্রবেশ।

দেবানিক। গুরুদেব, আপনার পূজোর জোগাড় হয়ে গেছে।

বিশ্বামিত্র। দূর হও অপদার্থ—!

দেবানিক। যা বাবা, খামকা আমার উপর রেগে গেলেন কেন, আমি তো আপনারই পূজোর জোগাড় করছিলাম।

বিশ্বামিত্র। পূজোর জোগাড় করছিলি? পূজোর জোগাড় করে আর কি হবে, যা ওসব জলে ফেলে দে।

দেবানিক। আ-হা-হা, কি হ'ল বলবেন তো?

কুমতি। রাজর্ষির সাধনায় বাধা পড়েছে।

দেবানিক। তার মানে!

কুমতি। ঐ দিকে চেয়ে দেখ।

দেবানিক। এ্যাঁ—মেয়ে তিনটি গেল কোথায়!

কুমতি। তুমি যখন আশ্রমের মধ্যে ছিলে, তখন মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এসে ওদের বাঁধন খুলে দিয়েছে।

দেবানিক। ও—এই জন্যে গুরুদেব রেগে আগুন। ঠিক আছে গুরুদেব, আপনি শান্ত হোন, আবার সামনের পূর্ণিমায় ওদের বাঁধবার ব্যবস্থা করুন, আমিও আবার সব ব্যবস্থা করে দেবো।

বিশ্বামিত্র। সে চিন্তা পরে করবো, তার আগে আমাকে অযোধ্যায় রাজপ্রাসাদে যেতে হবে—সেই অপরিণামদর্শী রাজাকে শাস্তি দিতে হবে।

কুমতি। শাস্তি দাও ঋষি—যে অপরাধ সে করেছে—তার উপযুক্ত শাস্তি দাও।

দেবানিক। না-না গুরুদেব, আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন!

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দেবানিক। ভেবে দেখুন, শত হলেও সে রাজা। হয়তো ভুল করে এই অপরাধ করে ফেলেছে।

বিশ্বামিত্র। ভুল করে আগুনে হাত দিলে আগুন তাকে ক্ষমা করে না দেবানিক।

দেবানিক। গুরুদেব—

বিশ্বামিত্র। না-না—বিশ্বামিত্রের অভিধানে ক্ষমা বলে কোন কথা নেই। রাজা হলেও সে অপরাধী, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। ক্ষমতার অহঙ্কারে সে যেমন আমার বুকে বজ্রের আঘাত হেনেছে—তেমনি আমিও তাকে চরম আঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দেব—বিশ্বামিত্রের সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার পরিণাম কত ভয়ানক—কত ভয়ঙ্কর—! [প্রস্থান।

দেবানিক। দিলে তো—দিলে তো ধার্মিক রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিলে তো!

কুমতি। সে যে অপরাধ করেছে।

দেবানিক। তাতে তোমার বাবার কি? তুমি কেন আশ্রমের মধ্যে এসে গুরুদেবের কানে বিষ মন্তর দিতে শুরু করেছো শুনি?

কুমতি। আমি তো ঋষির ভালোর জন্যেই—

দেবানিক। থাক—থাক, ভালো করতে হবে না। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছি। কি বলবো—তুমি যদি মেয়েছেলে না হতে তাহলে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দিতাম—হুঁ—পাজী—নচ্ছার কোথাকার— [প্রস্থান।

কুমতি। আশ্রমের কাজ শেষ। কুমতির পরামর্শে মহামুনি বিশ্বামিত্র আজ যাগ যোগ, পূজা অর্চনা ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। হিংসা আর ক্রোধের ক্রীতদাস হয়েছে। এইবার এই কুমতি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে কু-মন্ত্রণা দিয়ে এইভাবে চালিত করবে। তবেই হবে আমাদের জয়— [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মহেন্দ্রর কক্ষ।

মহেন্দ্র ও সন্ধ্যার প্রবেশ।

মহেন্দ্র। কথা শোন সন্ধ্যা—কথা শোন—

সন্ধ্যা। না-না—তোমার কোন কথা আমি শুনবো না।

মহেন্দ্র। আ-হা-হা—কেন এত মাথা গরম করছো! স্থির হয়ে আমার কথাটা একটু বুঝতে চেষ্টা কর।

সন্ধ্যা। কি বোঝাবে তুমি,—আমি সব বুঝেছি। মনে করেছ—ভালো ভালো শাড়ী আর গয়না এনে দিয়েছো বলে আমি তোমার পাপের পথকে সমর্থন করবো?

মহেন্দ্র। সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা। না—তা কোনদিন হবে না; ওসব গয়না-গাটী আমি কিছুই চাই না। আর ঐ পাপের পথেও তোমাকে অর্থ উপার্জন করতে আমি দেবো না।

মহেন্দ্র। আবার সেই এক কথা! তুমি বুঝতে পারছো না—অর্থ মানবের জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস বহন করে আনে। সেই অর্থ উপার্জন করতে একটু আধটু পাপের পথে চলতে হয়—তাতে কোন দোষ নেই।

সন্ধ্যা। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি—এ কথা বলতে তোমার মুখে একটুও আটকাচ্ছে না।

মহেন্দ্র। আটকাবে কেন, কথাটাতো সত্যি। আর এতে তোমরাও সুখী হবে।

সন্ধ্যা। তুমি বিশ্বাস কর—আমরা অনেক সুখী। ভগবান আমাদের অনেক দিয়েছেন, এর বেশী আর কিছু চাই না।

মহেন্দ্র। তুমি না চাইলেও আমি চাই।

সন্ধ্যা। বলতে পারছো—বলতে পারছো একথা! চিরদিন যাকে ধর্ম পথে চলতে দেখেছি, যার গরবে নিজেকে গরবিনী ভেবেছি, যাকে আমার মনের মন্দিরে বসিয়ে পূজো করেছি—তার মুখে আজ এ সব কথা শুনবো— এ আমি ভাবতেও পারছি না!

মহেন্দ্র। এতে না ভাবতে পারার কি আছে! এই তো জগতের চিরন্তন রীতি, সকলেই চায় সুখ-স্বচ্ছন্দের মধ্যে জীবন কাটাতে; আমিও তাই চাই। এতে আমার দোষ কোথায়?

সন্ধ্যা। তুমি তো এমন ছিলে না; এসব কথাতো তোমার মুখে কোনদিন শুনিনি! বল—কে তোমার মাথাটা খেয়েছে, কার যুক্তিতে তুমি এই ভুল পথে চলতে শিখেছো!

মহেন্দ্র। কেউ আমাকে যুক্তি দেয়নি, আমি নিজের ইচ্ছায় এ পথ বেছে নিয়েছি।

সন্ধ্যা। বা-বা-বা—মহারাজের সঙ্গে বেইমানি করে প্রজাদের অর্থ মেরে—আবার বুক ফুলিয়ে কথা বলছো! তোমার ভয় হচ্ছে না—লজ্জা করছে না!

কেশবের প্রবেশ।

কেশব। লজ্জা, লজ্জা কি ওর আছে মা! লজ্জা-ঘেন্না-ভয়—ওসব পুড়িয়ে খেয়ে বসে আছে।

সন্ধ্যা। বাবা—

কেশব। পাশের ঘর থেকে আমি সব শুনেছি বৌমা, তাই আর স্থির থাকতে পারলাম না।

মহেন্দ্র। তুমি আবার কি বলতে চাও?

কেশব। কি বলতে চাই? যে মহারাজ তোকে এত ভালবাসেন, অগাধ বিশ্বাস করেন—তুই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে গরীব প্রজাদের অর্থ মেরে নিজের জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে চাস!

সন্ধ্যা। ওকে শনিতে পেয়েছে বাবা—ওকে শনিতে পেয়েছে।

কেশব। হ্যাঁরে হতভাগা, কিসের অভাব তোর? গরীব চাষীর ছেলে তুই, কত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আমি তোকে দু'কলম লেখাপড়া শিখিয়েছি, মহারাজকে বলে-কয়ে রাজসরকারে চাকরী করে দিয়েছি। তাঁরই দয়ায় আজ তুই ভাল পোষাক পরছিস, ভাল খাচ্ছিস, কোঠা বাড়ীতে বাস করছিস—এতেও কি তোর শান্তি হচ্ছে না?

মহেন্দ্র। না। মানুষের আকাঙ্খার শেষ নেই। আমার আরও চাই—অনেক—অনেক চাই।

কেশব। মহেন—

মহেন্দ্র। তোমরা যদি পারো আমাকে সমর্থন কর, আর না হয় চোখ বুজে থাকো।

কেশব। খুন করবো—খুন করবো—আমি তোকে নির্ঘাৎ খুন করবো।

সন্ধ্যা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—তোমার এই অধঃপতনের কথা শুনে আমার যে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে!

মহেন্দ্র। থামো—থামো, ওসব আদিখ্যেতার কথা বলে আমাকে টলাতে পারবে না।

কেশব। এখনও ভাল কথা শোন মহেন, ওসব কু-মতলব মন থেকে

ঝেড়ে ফেলে দে—আমাদের ধর্ম-প্রাণ রাজার সঙ্গে বেইমানি করিসনি। প্রজাদের অর্থ তাদের মধ্যে বিলি করে আয়। তারপর—

মহেন্দ্র। তারপর—

কেশব। মনে মনে ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে বল—, ভগবান, আমাকে সুমতি দাও। আমি যেন চিরদিন ধর্মপথে চলতে পারি। আর যেন কোনদিন আমার মনে এই পাপ চিন্তা না জন্মায়।

মহেন্দ্র। তুমি বুঝতে পারছো না বাবা, আমি—

কেশব। আর বোঝা-বুঝিতে কাজ নেই, চল বাবা চল—প্রজাদের অর্থ দিয়ে দিবি চল।

মহেন্দ্র। না বাবা, আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি—তা আর হয় না।

কেশব। আলবৎ হয়। কথা শোন বাবা—কথা শোন, বাপ হয়ে আমি তোকে অনুরোধ করছি—এই অধর্মের পথে আর তুই চলিস না।

মহেন্দ্র। আঃ—কেন বিরক্ত করছো! বলেছি তো—আমি যা করেছি, যা করছি—তা ভাল বিবেচনা করেই করছি, এ নিয়ে তোমার মাথা ব্যথা করার কোন কারণ নেই।

সন্ধ্যা। চুপ কর—চুপ কর, এইভাবে বাবার মনে আঘাত দিওনা।

মহেন্দ্র। আমি কারও মনে আঘাত দিতে চাই না। তোমরা যদি আমার কথা না শোন—

কেশব। ওরে—এতবড় পাপ যে ধর্মে সইবে না। পাপ যে কোন-দিন বাপকেও ছেড়ে কথা বলে না।

মহেন্দ্র। আমি ওসব পাপ পুণ্য—ধর্ম-টর্ম মানি না।

সন্ধ্যা। তুমি না মানলেও আমরা যে মানি!

সন্ধ্যা। তুমি না মানলেও আমরা যে মানি।

মহেন্দ্র। তাহলে তোমরা তোমাদের মতই থাকো, আমি আমার পথেই চলবো।

কেশব। আমাদের কোন কথাই তাহলে তুই রাখবি না ?

মহেন্দ্র। কতবার বলবো—না—না—না—

কেশব। বেশ, তাহলে তুইও শুনে রাখ শুয়ার, আমিও তোর এ-বাড়ীতে আর থাকবো না, আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ করে দিলাম।

উভয়ে। বাবা—

কেশব। না-না, আমাকে তুই বাবা বলে ডাকিসনে, আমি তোর বাবা নই। হাজার দুঃখ কষ্ট সয়েও যে মহেন্দরকে আমি মানুষ করে তুলে-ছিলাম, ধর্মপথে চলতে শিখিয়েছিলাম—সে মহেন্দর মরে গেছে। তুই মহাপাপী—তুই অধামিক, তাই আজ থেকে তুই আমার শত্তুর—শত্তর—

[প্রস্থান।

সন্ধ্যা। বাবা—বাবা—ফিরে আসুন—ফিরে আসুন—।

মহেন্দ্র। সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা। কি করলে—কি করলে তুমি! শিগগির যাও, বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে আনো—।

মহেন্দ্র। আমি কোন অন্যায় করিনি—ক্ষমাও চাইবো না।

এক ছড়া হার হাতে ময়নার প্রবেশ।

ময়না। বৌদি—বৌদি, এই দেখ কি সুন্দর হীরের হার!

সন্ধ্যা। একি—এ হীরের হার তুই কোথায় পেলি ?

ময়না। ঐ যে দাদার বন্ধু—মানে সেনাপতি মশাই দিয়েছে।

মহেন্দ্র। কেরে ময়না, বিক্রমজিৎ ?

ময়না। হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঐ নামই তো বললে।

সন্ধ্যা। সে হার দিল আর তুই নিলি !

ময়না। বারে—আমি কি তার কাছে চেয়েছি নাকি? সেতো যেচেই দিলো।

সন্ধ্যা। যেচেই দিলো !

ময়না। হ্যাঁ বৌদি। আমি ফুল বাগানে ফুল তুলছিলাম, এমন সময় সে খটাখট খটাখট করে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলো। আমাকে ফুল বাগানে দেখে অমনি দাঁড়িয়ে গেল। তারপর চোখের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলো। আমিও একপা একপা করে তার কাছে গেলাম।

সন্ধ্যা। হুঁ—তারপর ?

ময়না। তারপর সে আমাকে বললে—ভয় নেই, আমি তোমার দাদার বন্ধু। এই নাও—এক ছড়া হার দিয়ে আজ থেকে তোমার সঙ্গেও বন্ধুত্ব পাতিয়ে গেলাম।

সন্ধ্যা। বটে—!

ময়না। এ ছাড়া আরও সে কত কথা বললে। জানো বৌদি, কি মিষ্টি তার কথা—শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

সন্ধ্যা। চুপ কর হতভাগী, যা—ফিরিয়ে দিয়ে আয় ঐ হার।

মহেন্দ্র। কেন—কেন—

সন্ধ্যা। বুঝতে পারছিস না—এই হার দেওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে।

মহেন্দ্র অসম্ভব! বন্ধু দিয়েছে বন্ধুর বোনকে, এর মধ্যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। হ্যাঁরে ময়না, বিক্রমজিৎ আর কিছু বললে ?

ময়না। বললে—আমাদের নাকি ভাগ্য ফিরে যাবে। তুমি নাকি বিরাট বাড়ী করবে, রাজার হালে সংসার চলবে, দাস-দাসী বাড়ীময় গিজগিজ করবে।

মহেন্দ্র। চুপ—চুপ—

সন্ধ্যা। ও—এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি।

মহেন্দ্র। কি বুঝেছ?

সন্ধ্যা। ঐ সেনাপতি মশাই কু-যুক্তি দিয়ে তোমার মাথাটি খেয়ে বসে আছে।

মহেন্দ্র। বাজে কথা বল না সন্ধ্যা। বিক্রমজিৎ আমার বন্ধু—আমার শুভাকাঙ্খী, তার সম্বন্ধে যা-তা মন্তব্য করলে আমি সহ্য করবো না।

সন্ধ্যা। বুঝেছি গো বুঝেছি, আর তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারবে না।

মহেন্দ্র। এ কথার অর্থ?

সন্ধ্যা। অর্থটা তুমিই ভালো জানো। ওগো—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার শুভ ছাড়া অশুভ কামনা করি না; তাই তোমার পায়ে ধরে বলছি—এখনও সময় আছে—এখনও কথা শোন।

মহেন্দ্র। সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা। ফেরো স্বামী— ফেরো, এ পথে অনেক কাঁটা, আলোকে অবজ্ঞা করে অন্ধকারে পা বাড়িও না। এ ভুলের মাশুল একদিন তোমাকে গুণতেই হবে, সেদিন অনুতাপের আর অন্ত থাকবে না।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ভুল—ভুল—আমি কোনদিন অনুতাপ করবো না সন্ধ্যা, করবে তুমি।

ময়না। কি হয়েছে দাদা—কি হয়েছে, বৌদি ওসব কথা বলে গেল কেন? তোমার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, তোর বৌদির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা—তুই বলতো ময়না, নিজের ভাগ্য ফেরাতে যদি আমি একটু বাঁকা পথে চলি—তাহলে কি আমার অন্যায় হবে?

ময়না। না-না, কিসের অন্যায়—কে বলে অন্যায়! নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে মানুষ অনেক কিছু করে, তাতে কোন অন্যায় হয় না।

মহেন্দ্র। কিন্তু তোর বৌদি আর বাবাকে কিছুতেই এই সহজ কথাটা বোঝাতে পারছি না। তারা বলে—এ নাকি পাপ—অধর্ম।

ময়না। ওসব ভুয়ো কথায় তুমি কান দিও না দাদা, তারা তোমাকে সমর্থন না করলেও—আমি তোমার সঙ্গে একমত। [প্রস্থান।

মহেন্দ্র। ময়না আমার সঙ্গে একমত। কিন্তু বাবা আর সন্ধ্যা যদি আমার বিরুদ্ধে—না-না, অসম্ভব! বিক্রমজিৎ যখন সহায় আছে—তখন আমার চলার পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদ।

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। মহারাজ নিমন্ত্রণে যাওয়ার পর থেকে আমার মন যেন দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছে। চারিদিকে অমঙ্গলের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। ঘন ঘন ডান চোখটা নাচছে। কেন আমার মনটা এমন ফাঁকা ফাঁকা

লাগছে! আর কেনই বা বার বার মনে হচ্ছে—তিনি খুব বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন!

রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। মা—মা—ওমা—মা—

শৈব্যা। কিরে রোহিত, তোর বাবা কি ফিরে এসেছে?

রোহিতাশ্ব। বারে—আমিইতো সেই কথা জিজ্ঞেস করবো বলে ছুটে এলাম, আর তুমি উল্টে আমাকেই জিজ্ঞেস করছো!

শৈব্যা। বোকা ছেলে, তিনি এলে আগে তো তুই-ই দেখতে পাবি। আচ্ছা রোহিত, তোর বাবার জন্যে তোর বুঝি মন কেমন করছে?

রোহিতাশ্ব। করবে না! বাবা বাড়ী না থাকলে আমার একদম ভাল লাগে না।

শৈব্যা। তাই বুঝি!

রোহিতাশ্ব। আচ্ছা মা, কোথাকার কে একটা মেয়ে এসে নেমন্তন্ন করলো—আর বাবা অমনি চলে গেল!

শৈব্যা। মেয়েটা যে প্রার্থী হয়ে এসেছিল বাবা।

রোহিতাশ্ব। প্রার্থী হয়ে এলেই যেতে হবে?

শৈব্যা। নইলে যে তার ধর্ম রক্ষা হবে না!

রোহিতাশ্ব। ধর্ম রক্ষা—

শৈব্যা। হ্যাঁ বাবা। আমি আশীর্বাদ করি—বড় হয়ে তুমিও তোমার বাবার মত ধর্ম রক্ষা করতে শিখো, আদর্শ প্রজাপালক হয়ো। তাইতো—এখনও তিনি ফিরছেন না কেন। তবে সত্যি সত্যিই কি কোন বিপদে পড়লেন!

রোহিতাশ্ব। না মা, বাবার কোন বিপদ হতে পারে না। সকলে

বলে—আমার বাবার মত ধর্মপ্রাণ রাজা হয় না। কেউ কোনদিন তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

শৈব্যা। তাই বল বাবা—তাই বল, তোর মুখের কথা যেন সত্যি হয়।

রোহিতাশ্ব। নিশ্চয়ই সত্যি হবে। জানো মা, ধর্মের নাকি ক্ষয় নেই—মৃত্যু নেই—ধর্ম নাকি অন্ধকারে আলো দেখায়। সেই ধর্ম যদি সহায় থাকে—সব বিপদ দূর হয়ে যায়।

শৈব্যা। এসব কথা তোকে কে শেখালো রোহিত ?

রোহিতাশ্ব। কেন—আমাদের মন্দিরের পূজারী সেই সত্যসন্ধ দাদা—

শৈব্যা। সত্যসন্ধ তোকে এসব কথা শিখিয়েছে !

রোহিতাশ্ব। হ্যাঁ মা, সেই সঙ্গে একখানা খুব ভালো গানও শিখিয়েছে।

শৈব্যা। গান ! কি গান ?

রোহিতাশ্ব। শুনবে ? তবে শোন—

গীত।

যথা ধর্ম তথা জয়।

দুঃখ জ্বালার হয় অবসান, অবসান হয় বিপদ ভয়।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। নারায়ণ—বিপদ বারণ, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে তোমার চরণে যদি কোন অপরাধ করে থাকি—তুমি আমাকে শাস্তি দাও, বিনিময়ে আমার স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কর ঠাকুর—মঙ্গল কর।

হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। মঙ্গলময়ের আশীর্বাদে আমি সুস্থ শরীরেই এসে গেছি শৈব্যা।

শৈব্যা। একি—তুমি এসে গেছো! রোহিত—রোহিত—

হরিশ্চন্দ্র। রোহিতকে ডাকতে হবে না রানী, আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তাকে আদর করেই এসেছি।

শৈব্যা। যাক—নিশ্চিন্ত। ছেলেটা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

হরিশ্চন্দ্র। আর তুমিও খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলে—তাই না?

শৈব্যা। সত্যি মহারাজ। কতদিন তুমি কত জায়গায় গেছ—কত মৃগয়ায় গেছ—কোনদিন আমি এত দুশ্চিন্তা করিনি—যত চিন্তা করেছি আজ। কিন্তু তোমার ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন? কোন বিপদে পড়েছিলে না তো?

হরিশ্চন্দ্র। তোমার অনুমান অভ্রান্ত রানী।

শৈব্যা। সেকি! তবে—

হরিশ্চন্দ্র। তোমার মত কল্যাণময়ী স্ত্রী যার ঘরে, ধর্ম যার জীবনের একমাত্র সহায় সম্বল—বিপদ কি তাকে বেশীক্ষণ গ্রাস করে রাখতে পারে!

শৈব্যা। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। শোন রানী, সেদিন যে বালিকা আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল, সে সামান্য নারী নয়—সে এক মায়াবিনী—কালভুজঙ্গিনী—

শৈব্যা। কালভুজঙ্গিনী!

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ। নিমন্ত্রণের ছলনায় আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার মাথায় দংশন করতে চেয়েছিল। মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ করে আমার চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে উদ্যত হয়েছিল।

শৈব্যা। কি বলছো রাজা!

হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু ধর্মকে স্মরণ করে সেই মায়াবিনীর সব মায়াজাল ছিন্ন করে আমি বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছি।

শৈব্যা। এইবার বুঝেছ রাজা, কেন আমি সেই দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, আর কেনই বা সত্যসন্ধ তোমাকে যেতে নিষেধ করেছিল ?

হরিশ্চন্দ্র। বুঝেছি রানী—সব বুঝেছি। কিন্তু ঈশ্বরই যে আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গেছেন—তাইতো আমি গেছি।

রাঘব রায়ের প্রবেশ।

রাঘব। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। এই যে মহামন্ত্রী, পান্থনিবাস সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়েছে ?

রাঘব। হয়েছে। কিন্তু একটা পান্থনিবাস সংস্কার করলে তো হবে না মহারাজ—দুষ্কৃতকারীরা কাল রাত্রে ভদ্রকালীর মন্দির ধ্বংস করে গেছে।

হরিশ্চন্দ্র। সেকি—!

শৈব্যা। কি বলছেন মহামন্ত্রী !

রাঘব। কি আর বলবো মা, মহারাজ হরিবিজের আমল থেকে আমি এ রাজ্যের মন্ত্রীত্ব করে আসছি, কিন্তু কোনদিন যা হয়নি—যা শুনিনি, রাজ্যের মধ্যে আজ তাই ঘটে যাচ্ছে !

হরিশ্চন্দ্র। আর আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপছে। আশীর্বাদের পরিবর্তে দেবতারা অভিশাপ বর্ষণ করছে। প্রজারা আমার নামে ঘৃণায় থুথু ফেলছে।

শৈব্যা। প্রতিকার কর রাজা—প্রতিকার কর। চতুর্দিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে দাও, যেমন করে হোক তাদের বন্দী করে এনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর। অযোধ্যা থেকে অত্যাচারীর নাম চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন করে দাও— [প্রস্থান।

রাঘব। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি মহামন্ত্রী, রাজ্যে এত প্রহরী—নগর কোটাল—সৈন্য-সেনাপতি থাকতে কি করে দুষ্কৃতকারীরা এ কাজ করতে সক্ষম হ'ল! আর ধর্মস্থানের উপরেই বা তাদের এত আক্রোশ কেন?

রাঘব। আমার মনে হয়—নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীর সহযোগীতা আছে।

হরিশ্চন্দ্র। রাজকর্মচারী! কি বলছেন মহামন্ত্রী! কাকে আপনি সন্দেহ করেন?

রাঘব। সেনাপতি বিক্রমজিৎ।

হরিশ্চন্দ্র। বিক্রমজিৎ! না-না এ হতে পারে না। একদিন যে নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি, সামান্য সৈনিকের পদ থেকে সেনাপতি পদে তুলে দিয়েছি—সে যে কখনও দুষ্কৃতকারীদের সহযোগিতা করে আমার বিরুদ্ধাচারণ করবে—এ আমি ভাবতেও পারি না!

রাঘব। অবশ্য এ আমার অনুমান মাত্র। তবে একটা কথা চিন্তা করার আছে মহারাজ, যেদিন থেকে সে সেনাপতি হয়েছে—সেদিন থেকেই রাজ্যের মধ্যে এই উচ্ছৃঙ্খল আরম্ভ হয়েছে এবং কিছুদিন যাবৎ তার চাল-চলন কথাবার্ত্তা আমার কেমন সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাছাড়া আমি সংবাদ নিয়েছি—কোন রাত্রেই সে সৈন্যাবাসে থাকে না। কোথায় যায়, কি করে—কেউ বলতে পারে না।

হরিশ্চন্দ্র। আপনার দূরদৃষ্টির আমি প্রশংসা করি। কিন্তু শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করে তো কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না মহামন্ত্রী—তার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ চাই!

কেশবের প্রবেশ।

কেশব। মহারাজ আছেন—মহারাজ, এই যে মহারাজ—নমস্কার।

রাঘব। একি—তুমি!

কেশব। আমাকে চিনতে পারলেন না! আমি কেশব চাষী—মহেন্দর বাবা।

রাঘব। কি বলতে এসেছো তুমি?

কেশব। শিগ্‌গির সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে—সেই বিশ্বাসঘাতককে বেঁধে আমুন।

রাঘব। কে বিশ্বাসঘাতক?

কেশব। আমার ছেলে মহেন্দর।

হরিশ্চন্দ্র। মহেন্দ্র—!

কেশব। হ্যাঁ-হ্যাঁ—মহেন্দর। সে কি করেছে জানেন—আপনি প্রজাদের মধ্যে যে টাকা বিলি করতে দিয়েছিলেন, মহেন্দর তার অর্দ্ধেক টাকা মেরে দিয়েছে।

রাঘব। সেকি—কি বলছো তুমি!

কেশব। হ্যাঁ মন্ত্রীমশাই। চাষীর ছেলে রাজপুরুষ হয়েছে—তাতেও তার আশা মেটেনি। এখন প্রজাদের অর্থ মেরে আরও উপরে উঠতে চায়। সাত-মহলা বাড়ীতে থাকবে—রাজভোগ খাবে—আরও কত কি—

রাঘব। শুনেছেন? শুনেছেন মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র। শুনেছি, আর ভাবছি—এও কি সম্ভব! যে মহেন্দ্রকে আমি এত ভালবাসতাম—এত বিশ্বাস করতাম—সেই মহেন্দ্র কি করে এতবড় বিশ্বাঘাতক হতে পারে!

রাঘব। আমিও তো তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি মহারাজ, মানুষ কি করে এতখানি অকৃতজ্ঞ হয়, অমৃত কি করে বিষ হয়ে যায়!

কেশব। যায়—যায়, আমিও কি জানতাম যে আমার ছেলে এমন হয়ে যাবে! কিন্তু হয়ে গেল। টাকায় তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, মনের মধ্যে একটা দুরাকাঙ্খার রাক্ষস জন্ম নিয়েছে—তাই সে এই ভুল পথে চলেছে, আমি আর বৌমা তাকে অনেক বুঝিয়েছি—এ পাপ—এ অন্যায়, অনেকবার বলেছি—প্রজাদের টাকা বিলি করে দিয়ে আয়, কিন্তু সে আমাদের কোন কথা শুনল না।

হরিশ্চন্দ্র। তাই তুমি পিতা হয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছ?

কেশব। কেন আসবো না—ধর্ম্মতো আছে। সারাজীবন ধরে যে ধর্ম্ম মেনে এসেছি—আজ শেষ বয়সে ছেলের মায়ায় সেই ধর্ম্মকে আমি কানাকড়ির দামে বিকিয়ে দেব!

হরিশ্চন্দ্র। বাঃ—চমৎকার—চমৎকার! এইতো মানুষ, একেই তো বলে ধর্মপ্রাণ! দেখুন—দেখুন মহামন্ত্রী, এই আমার রাজ্যের প্রজা। হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীকে উপবাসী রেখে পুত্রস্নেহ বিসর্জন দিয়ে শুধু ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

রাঘব। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। যান মহামন্ত্রী, এখুনি সেনাপতি বিক্রমজিৎকে পাঠিয়ে মহেন্দ্রকে বন্দী করে আনার ব্যবস্থা করুন। আমি তাকে একটা কথাই জিজ্ঞাসা করবো—এই কি আমার ভালবাসার মূল্য—বিশ্বাসের প্রতিদান?

রাঘব। যাচ্ছি মহারাজ। তবে আমি যে কথাটা বলেছিলাম সে বিষয়ে একটু চিন্তা করে দেখবেন মহারাজ। সকলকে সরল বিশ্বাস করে

হাল ছেড়ে দেবেন না, তাহলে এইভাবেই আঘাত খেতে হবে। কারণ—ভালোর মধ্যেও যে কালো থাকতে পারে তার প্রমাণ তো আজ হাতে হাতেই পেলেন— [প্রস্থান।

কেশব। অপরাধ নেবেন না মহারাজ, আপনার ঐ সেনাপতি মশাইকে আমার বিশেষ ভালো বলে মনে হয় না। আজ কিছুদিন ধরে দেখছি সে যেন মহেন্দর সঙ্গে কি শলাপরামর্শ করে। রাত বিরেতে তাকে নিয়ে বেড়াতে যায়। আমার মনে হয় মহারাজ, ঐ সেনাপতি মশাই মহেন্দরকে এই কুমতলব দিয়ে মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। নইলে ছেলেটা তো আমার এমন ছিল না!

হরিশ্চন্দ্র। আমারও তাই মনে হয়—কেউ তাকে কুপরামর্শ দিয়ে ভুল পথে চালিত করছে। তাইতো তাকে বন্দী করে আনতে পাঠিয়েছি—শাস্তি দেবো বলে নয়—ভালো হওয়ার সুযোগ দেব বলে।

কেশব। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। যাও বৃদ্ধ, তোমাকে পুরস্কার দিয়ে এই মানবতার অপমান আমি করতে চাই না। তবে একটা কথা জেনে রেখো—তোমার এই সত্যনিষ্ঠা, এই আদর্শের কথা রাজা হরিশ্চন্দ্র চিরদিন মনে করে রাখবে।

কেশব। না-না, আমি মুখ্যু চাষী, আমার কথা আপনাকে মনে করে রাখতে হবে না মহারাজ, আপনি শুধু আমার ছেলেটাকে ভালো করে দিন, ভগবান আপনার মঙ্গল করবে—ভগবান আপনার মঙ্গল করবে— [প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। মহেন্দ্র বিশ্বাসঘাতক, সেনাপতির কার্যকলাপ সন্দেহজনক, বারে জগৎ! যাদের একদিন ভালবেসে বুকে তুলে নিয়েছিলাম—তারাই আমার মাথায় দংশন করতে চাইছে! বাঃ—চমৎকার—চমৎকার এই সংসার!

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। রাজা হরিশ্চন্দ্র—

হরিশ্চন্দ্র। কে? একি—বিশ্ববন্দিত ঋষি বিশ্বামিত্র! কি ভাগ্য আমার—যে আজ এই দীনের ভবনে রাজর্ষির শুভ পদার্পণ! শৈব্যা—শৈব্যা—শীঘ্র করে পাদ্যার্ঘ নিয়ে এসো—শঙ্খধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ মুখরিত কর।

বিশ্বামিত্র। স্থির হও রাজা, আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণ করতে আসিনি—এসেছি তোমার অপরাধের শাস্তি দিতে।

হরিশ্চন্দ্র। আমার অপরাধের শাস্তি! কোথায়—কবে—কার কাছে আমি অপরাধ করেছি ঋষি!

বিশ্বামিত্র। আমার কাছে তুমি অপরাধী রাজা।

হরিশ্চন্দ্র। তোমার কাছে!

বিশ্বামিত্র। বল—কেন তুমি আমার পুষ্পোদ্যানে গিয়েছিলে—আর কেনই বা আমার বন্দিনীদের মুক্ত করে দিয়েছো?

হরিশ্চন্দ্র। তোমার বন্দিনী কিনা আমি জানি না ঋষি, তবে এক কুহকিনীর ছলনায় ভুলে তোমার পুষ্পোদ্যানে গিয়েছিলাম সত্য। এমন সময় নারীর কাতর কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখলাম—বিপন্না তিন নারী লতাগুল্মে বন্দিনী হয়ে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছে। তাই—

বিশ্বামিত্র। তাই তুমি ক্ষমতার অহঙ্কারে তাদের মুক্ত করে দিয়ে তোমার মহত্ত্ব দেখিয়েছো!

হরিশ্চন্দ্র। ক্ষমতার অহঙ্কারে নয় ঋষি, মহত্ত্বও আমি দেখাইনি—আমি শুধু আমার রাজধর্ম পালন করেছি।

বিশ্বামিত্র। আমার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে রাজধর্ম পালন!

হরিশ্চন্দ্র। আমি তোমার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি!

বিশ্বামিত্র। একবার নয়—শতবার। বল—বন্দিনীদের মুক্ত করার সময় কেহ তোমাকে বাধা দিয়েছিলো?

হরিশ্চন্দ্র। না। আর বাধা দিলেও আমি তা মানতাম না ঋষি।

বিশ্বামিত্র। জানো—কাদের তুমি মুক্ত করে দিয়েছো—কি তাদের পরিচয়?

হরিশ্চন্দ্র। নারী—শুধু নারী—অন্য কোন পরিচয় নেবার প্রয়োজন হয়নি ঋষি।

বিশ্বামিত্র। স্তব্ধ হও রাজা, নারী—নারী—নারী! সামান্য নারী মনে করে যাদের তুমি মুক্ত করে দিয়েছো—জানো তারা কারা? তারা এই সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয়ের প্রতীক। আমি তাদের বন্দিনী করে ত্রিবিদ্যা সাধনে ব্রতী হয়েছিলাম—সর্বশক্তি করায়ত্ব করবো বলে। কিন্তু তুমি—তুমি সেই জয়ের মুহূর্তে আমার মুখে পরাজয়ের কালি মাখিয়ে দিয়েছো। আমার আশার সৌধ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছো। আমাকে সু-উচ্চ পর্বত শিখর থেকে কঠিন মাটির বুকে নিক্ষেপ করেছো।

হরিশ্চন্দ্র। ঋষি—ঋষি—

বিশ্বামিত্র। ওঃ—কি করেছো—কি করেছো রাজা! তোমাকে তুষানলে দগ্ধ করলে অথবা সবংশে ধ্বংস করলেও যে আমার এ জ্বালার অবসান হবে না।

হরিশ্চন্দ্র। ঋষি, সত্যিই যদি তোমার বিচারে আমি অপরাধী হয়ে থাকি,—তুমি আমাকে অভিশাপ দাও, আমি হাসিমুখে সেই অভিশাপ মাথা পেতে নেবো।

বিশ্বামিত্র। অনুতাপ হচ্ছে?

হরিশ্চন্দ্র। না ঋষি, আমি কোন অন্যায় করিনি—অনুতাপও রবো না।

বিশ্বামিত্র। এখনও বলছো তুমি—কোন অন্যায় করিনি!

হরিশ্চন্দ্র। এখনও বলছি—আমি কোন অন্যায় করিনি। তুমি ঋষি, গতের মঙ্গল কামনায় দেবতার আরাধনা করা যেমন তোমার ধর্ম, তমনি আমিও তো রাজা,—বিপন্নকে রক্ষা করাও তো আমার কর্ত্তব্য।

বিশ্বামিত্র। সাবধান রাজা, এখনও সংযত হও। কৃতকর্মের জন্য নুতপ্ত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর। রাজর্ষির ক্রোধের মাত্রা আজ শেষ ীমায়।

হরিশ্চন্দ্র। তবুও আমি বলব—আমি নিরপরাধ। আমি আমার র্তব্য পালন করেছি মাত্র। সামান্য নারীই হোক—স্বর্গের দেবীই হোক থবা কীট-পতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে যে কোন প্রাণীই হোক না কেন— বপন্নকে উদ্ধার করাই রাজধর্ম।

বিশ্বামিত্র। রাজধর্ম—রাজধর্ম, বার বার সেই একই কথা—রাজধর্ম। ল রাজা, কি কি ধর্মকে অবলম্বন করে তুমি রাজসিংহাসনে বসেছো?

হরিশ্চন্দ্র। নিরন্নকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ, আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম দান—এই আমার জীবনের ব্রত।

বিশ্বামিত্র। বেশ তাই যদি হয়—তাহলে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আজ তোমার কাছে প্রার্থী রাজা।

হরিশ্চন্দ্র। রাজর্ষি—

বিশ্বামিত্র। বল—আমাকে তুমি কি দান করতে পার?

হরিশ্চন্দ্র। যদি চাও—রানী শৈব্যা আর কুমার রোহিতাশ্বকে নিয়ে তোমার চরণে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি।

বিশ্বামিত্র। না-না, তোমাদের প্রাণ নিয়ে আমি কি করবো?

হরিশ্চন্দ্র। তবে কি চাও ঋষি?

বিশ্বামিত্র। আমি যা চাই শুনলে তোমার বুক কেঁপে উঠবে না তো রাজা?

হরিশ্চন্দ্র। না।

বিশ্বামিত্র। দান দিতে অস্বীকার করবে না তো?

হরিশ্চন্দ্র। তার পূর্বে যেন আমার মাথায় বজ্রঘাত হয়।

বিশ্বামিত্র। তবে শোন রাজা, আমি চাই—তোমার রাজ্য তথা সসাগরা ধরণীর আধিপত্য ভার।

হরিশ্চন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—অধীনের সঙ্গে একি রহস্য প্রভু!

বিশ্বামিত্র। রহস্য—

হরিশ্চন্দ্র। নয়তো কি। একদিন যে—রাজ-সিংহাসন, রাজ-আভরণ রাজভোগ ধুলিমুষ্টির মত ত্যাগ করে তাপসের বেশ ধারণ করেছে, তপের প্রভাবে ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছে—সেই মহাতপা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আমার কাছে রাজ্য প্রার্থনা করছে—একি সত্যি!

বিশ্বামিত্র। সত্য—সত্য—চন্দ্র সূর্য্যের মতই সত্য। বল রাজা, আমার প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করবে?

হরিশ্চন্দ্র। অম্লান বদনে। ধর্ম সাক্ষী রেখে, সাক্ষী রেখে তেত্রিশ-কোটী দেবতা—এই মুহূর্তে সসাগরা পৃথিবীই আমি তোমাকে দান করলাম ঋষি। আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি—আজ থেকে অযোধ্যার রাজা এই হরিশ্চন্দ্র নয়—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। সাধু—সাধু, দান তো করলে রাজা কিন্তু দানের দক্ষিণা!

হরিশ্চন্দ্র। দক্ষিণা!

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ দক্ষিণা। জানো না—দক্ষিণা বিনা যে দান সিদ্ধ হয় না!

হরিশ্চন্দ্র। তার জন্য চিন্তা কেন ঋষি, এখুনি আমি রাজকোষ থেকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা এনে তোমাকে দানের দক্ষিণা দেব।

বিশ্বামিত্র। দাঁড়াও রাজা, কেন ভুলে যাও—এই মাত্র তুমি আমাকে সসাগরা পৃথিবী দান করেছ। তোমার রাজ্যের প্রজা থেকে আরম্ভ করে ধন-রত্ন—জল-স্থল—অরণ্য—পর্বত—সব কিছুই এখন আমার। সুতরাং রাজ ভাণ্ডারে আর তোমার কোন অধিকার নেই।

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমি ভুলেই গেছিলাম ঋষি, আর আমার কোন কিছুতেই অধিকার নেই। কিন্তু দানের দক্ষিণা—

বিশ্বামিত্র। না দিতে পার দান ফিরিয়ে নাও।

হরিশ্চন্দ্র। প্রাণান্তেও নয়।

বিশ্বামিত্র। কিন্তু দক্ষিণা না দিলে তো আমি দান গ্রহণ করতে পারি না রাজা।

হরিশ্চন্দ্র। দেব—দেব ঋষি, নিশ্চয়ই আমি দক্ষিণা দেব। তবে আমাকে এক মাসের সময় দিতে হবে।

বিশ্বামিত্র। বেশ তাই হবে। কিন্তু আমার প্রাসাদে তো আর তোমাদের থাকা চলবে না রাজা। তাই আমার আদেশ, কাল সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এক বস্ত্রে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু সাবধান—রাজ-আভরণ, রাজ-পরিচ্ছদ—এমন কি অযোধ্যার একটা কানাকড়িও নিয়ে যেতে পারবে না।

হরিশ্চন্দ্র। তাই হবে ঋষি, তোমার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

বিশ্বামিত্র। সেই সঙ্গে আরও মনে থাকে যেন—এক মাসের মধ্যে

দানের দক্ষিণা যদি না পাই—তোমার দান তোমাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। [প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। তুমিও শুনে যাও ঋষি, আমিও সূর্য বংশধর, প্রাণ দেব তবু সত্য ভঙ্গ করবো না। আঃ—আজ আমার কি শান্তি—কি তৃপ্তি! রাজ-ঐশ্বর্যের অক্টোপাস থেকে আজ আমি মুক্ত। কাকে বলি—কে শুনবে এই আনন্দের কথা। শৈব্যা—শৈব্যা—

শৈব্যার পুনঃ প্রবেশ।

শৈব্যা। কি হয়েছে—কি হয়েছে—

হরিশ্চন্দ্র। এসেছো—এসেছো শৈব্যা, এসো—এসো! আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন! এতদিন যে বাঁধন আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, আজ আমরা সে বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েছি। আনন্দ কর—আনন্দ কর!

শৈব্যা। কি বলছো রাজা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

হরিশ্চন্দ্র। বুঝতে পারছো না? তবে শোন—আমার রাজত্বে অরাজকতা দেখা দিয়েছে, দেব মন্দির ধ্বংস হয়েছে। আমি অক্ষম রাজা, তাইতো দেবতারা আমাকে মুক্তি দিতে দেবদূত পাঠিয়েছিল।

শৈব্যা। স্বামী—

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ-হ্যাঁ—কিছুক্ষণ আগে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। আমার রাজত্ব প্রার্থনা করেছিল, তাই আমি তাঁকে আমার রাজ-ঐশ্বর্য—সব কিছু দান করে দিয়েছি।

শৈবা। রাজর্ষি এসেছিলেন তোমার কাছে প্রার্থী হয়ে!

হরিশ্চন্দ্র। বল—বল শৈব্যা, এতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না—গর্ব হচ্ছে না!

শৈব্যা। গর্ব হবে না—বল কি স্বামী! আজ গর্বে আনন্দে বুকখানা আমার দশহাত ফুলে উঠেছে। ত্রিলোক বন্দিত ঋষি তোমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছিল আর তুমি তাঁকে দান করেছ—একি কি কম আনন্দের কথা!

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা—

শৈব্যা। তুমি সূর্যবংশের উপযুক্ত কাজই করেছ। এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর আমাদের কিছু হতে পারে না রাজা?

হরিশ্চন্দ্র। রাজা! না-না, আর আমাকে তুমি রাজা বল না শৈব্যা, এখন আর আমি রাজা নই—সাধারণ মানুষ—দীন ভিখারী বললেও ভুল হবে না।

শৈব্যা। কে বললে তুমি দীন ভিখারী! এতবড় রাজ্যটাকে যে এক কথায় দান করতে পারে—সে যদি দীন ভিখারী হয় তবে রাজা কে!

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা—

শৈব্যা। নাইবা থাকলো তোমার মাথায় রাজ মুকুট, নাইবা থাকলো রাজ-ঐশ্বর্য—তবু শৈব্যার কাছে তুমি রাজা। আমার হৃদয় রাজ্যের রাজা। সুনির্মল আকাশ তোমার রাজছত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার রাজত্ব। তুমি রাজা—না-না শুধু রাজা নও—রাজরাজেশ্বর তুমি রাজাধিরাজ।

হরিশ্চন্দ্র। ঠিক বলেছ তুমি। এতদিন শুধু রাজা ছিলাম, আজ আমি সত্যিই রাজাধিরাজ, প্রস্তুত হও শৈব্যা, কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমরা দীন ভিখারীর মত এক বস্ত্রে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো।

শৈব্যা। আমি প্রস্তুত স্বামী। কিসের দুঃখ, কিসের ব্যথা! আমি যে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, আকাশ বাতাস তোমার জয়গান গাইছে, পৃথিবীর মানুষ তোমার দানের মহিমা কীর্তন করছে—আমি কি তোমার সেই দানের অমর্যাদা করতে পারি!

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা, তুমি—

শৈব্যা। না-গো-না—পরি না দীন ভিখারীর বেশ, সে আজ আমার কাছে রাজবেশের বেশী। আমি যে তোমারই স্ত্রী—তোমারই সহধর্মিণী—

[প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। এমন সহধর্মিণী যার ঘরে—নরকও তার কাছে স্বর্গের সমান।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

মহেন্দ্রর বাড়ী।

সন্ধ্যা ও ময়নার প্রবেশ।

সন্ধ্যা। এখনও ভালো কথা শোন ময়না, ঐ সেনাপতির সঙ্গে আর কোনদিনও কথা-বার্তা বলিসনে। ওর চাল-চলন, কথা-বার্তা আমার মোটেই ভালো লাগে না।

ময়না। তোমার তো অনেক কিছুই ভালো লাগে না বৌদি, তাই বলে তোমার মত নিয়ে তো আর জগৎ চলে না!

সন্ধ্যা। ময়না—

ময়না। অমন মিষ্টি ব্যবহার, মিষ্টি চেহারা—তার উপর এতবড় একটা সেনাপতি হয়েও, কোন অহঙ্কার নেই। এমন লোক যদি তোমার কাছে ভালো না লাগে—তাহলে বুঝবো ভালো লোক তুমি কোনদিন চোখে দেখোনি।

সন্ধ্যা। বুঝেছি—এক ছড়া হার দিয়ে আর ঐ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে এই দুদিনের মধ্যেই সে তোকে যাদু করে ফেলেছে। তাই ভাল-মন্দ বিচার করার শক্তিও তুই হারিয়ে ফেলেছিস।

ময়না। কি বলতে চাও তুমি ?

সন্ধ্যা। তুই তার উপরটাই দেখেছিস—ভেতরটা চিনতে পারিসনি।

ময়না। তোমার চেনা-চিনি নিয়ে তুমি থাকো, আমাকে আর চেনাতে হবে না। আমার দাদা যাকে বিশ্বাস করে, যার সঙ্গে মেলামেশা করে, আমাকে কথা বলতে সুযোগ দেয়—তুমি কিনা তারই সম্বন্ধে যা তা মন্তব্য করছো !

সন্ধ্যা। তোর দাদার মাথাটাও যে খারাপ করে দিয়েছে। নইলে যে লোক পাপ হওয়ার ভয়ে কোনদিন একটা মিথ্যে কথা পর্যন্ত বলেনি—সে আজ এতবড় পাপের পথে পা বাড়ায় !

ময়না। তুমি কিন্তু সবটাতেই বাড়াবাড়ি করছো বৌদি। দাদা যা করেছে—ঠিকই করেছে, এতে কোন পাপ নেই।

সন্ধ্যা। আশ্চর্য ! আগে তো তোরা এমন ছিলি না, এই কদিনের মধ্যে কি করে এমন হয়ে গেলি বলতো !

ময়না। মানুষ যে চিরদিন একই রকম থাকবে এমন তো কোন কথা নেই বৌদি !

সন্ধ্যা। আমার কোন কথাই তুই শুনবি না ?

ময়না। শোনার মত হলে নিশ্চয়ই শুনতাম।

সন্ধ্যা। ও—আমার কথা আজ আর তোর শোনার মত নয় ! অথচ এই বৌদির কথাই একদিন তোর কাছে বেদবাক্য ছিল। সেই তুই আজ—

ময়না। বড় হয়েছি, ভাল-মন্দ চেনার ক্ষমতাও হয়েছে, তাই

সেনাপতির সঙ্গে মেলামেশা করছি—করবো, তুমি হাজার বারণ করলেও শুনবো না—শুনবো না—শুনবো না।

সন্ধ্যা। তা শুনবি কেন—এখন তুই বড় হয়েছিস, বোঝার শক্তি হয়েছে, তাই আমার কথা আজ বড় তেতো লাগছে। কিন্তু মনে রাখিস ময়না, গরীবের কথা বাসী হলেই মিষ্টি লাগে।

ময়না। বৌদি—

সন্ধ্যা। তাই আবার বলছি—কাঁচকে কাঞ্চন মনে করে ধরতে যাসনি—ঠকবি।

ময়না। ঠকতে হয় আমি ঠকবো—তাতে তোমার কি ? তুমি তো আর ঠকবে না !

সন্ধ্যা। তা যা বলেছিস, তুই ঠকলে আমার কি।

ময়না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি বৌদি, হীরের হারছড়া আমাকে না দিয়ে যদি তোমাকে দিত—তাহলে নিশ্চয়ই তুমি তার গুণগান করতে।

সন্ধ্যা। কি—এতবড় কথা তুই আমাকে বলতে পারলি !

ময়না। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্যি।

সন্ধ্যা। ময়না—

ময়না। শোন বৌদি, আমি তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি—তুমি তোমার মতই থাকো। আমি কি করছি না করছি সে আমার দাদাই ভাববে, তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

[প্রস্থান।

সন্ধ্যা। বাঃ—চমৎকার—চমৎকার ! অন্যায় সইতে না পেরে শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন, স্বামী অধর্মের পথ বেছে নিয়েছে, আর ননদ—সেও আমাকে ভুল বুঝে অপমান করে গেল ! একি হল—একি হল ঠাকুর।

এমন একটা শান্তির সংসারে কেন এই অশান্তির আগুন জ্বলে উঠলো। কেন সংসারের আজ এই পরিবর্তন হল !

মহেন্দ্রর প্রবেশ।

মহেন্দ্র। পরিবর্তনশীল জগতে সব কিছুরই পরিবর্তন হয় সন্ধ্যা। যারা সেটা মেনে নিতে পারবে তারাই সুখী হবে—আর যারা মানতে পারবে না—তারা অশান্তিতে ভুগবে। যেমন তুমি।

সন্ধ্যা। বা—বেশ সুন্দর ভাবে সাজিয়ে কথা বলছো দেখছি ! প্রাণের বন্ধু শিখিয়ে দিয়েছে বোধ হয় ?

মহেন্দ্র। সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা। বলি নিজে তো উচ্ছন্নে গেছোই, বোনটাকেও আবার সে পথে নিয়ে যাচ্ছো কেন—শুনি ?

মহেন্দ্র। কি—আমি ময়নাকে—

সন্ধ্যা। একশোবার। তা যদি না হবে, কেন ঐ সেনাপতি ময়নার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়, আর কেনই বা ময়নাকে তুমি সে সুযোগ দাও ?

মহেন্দ্র। ও—হাঃ-হাঃ-হাঃ—এই কথা ! আমি বুঝে-সুজেই ওদের মেলামেশার সুযোগ করে দিই।

সন্ধ্যা। তার মানে ?

মহেন্দ্র। মানে—ময়নার বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে। কাজে-কাজেই ওদের মধ্যে যদি ভাব-ভালবাসা জমে যায়—

সন্ধ্যা। ঐ সেনাপতির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবে !

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, তাতে ময়না সুখী হবে।

সন্ধ্যা। যেহেতু সে তোমার বন্ধু।

মহেন্দ্র। তার উপর অমন একটা ভালো লোক।

সন্ধ্যা। ভালো লোক—ভালো লোক, কথাটা শুনতে শুনতে কান-দুটো আমার ঝালাপালা হয়ে গেল। যে লোক—মেয়েরা নদীতে স্নান করতে গেলে সেখানে গিয়ে চোখের ইশারায় মেয়েদের কুৎসিত ইঙ্গিত করে, গৃহস্থেরা যাকে দেখে ভয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়—তোমার কাছে সে ভালো লোক হলেও আমার কাছে সে ভালো লোক নয়।

মহেন্দ্র। মিথ্যে কথা। তুমি তাকে দেখতে পারো না তাই এইসব মনগড়া কথা বলছো। আমি বলছি—বিক্রমজিৎ সে প্রকৃতির লোক নয়।

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রমজিৎ। থাক-থাক বন্ধু, আমাকে নিয়ে কথা কাটাকাটি করে নিজেদের মধ্যে আর অশান্তির সৃষ্টি করো না।

সন্ধ্যা। একি—আপনি একেবারে বাড়ীর মধ্যে—!

বিক্রমজিৎ। আমি জানি—আমার এখানে আসাটা আপনি পছন্দ করেন না।

সন্ধ্যা। জানেনই যদি—তাহলে এলেন কেন ?

বিক্রমজিৎ। যদি বলি—আপনার স্বামীকে বন্দী করতে এসেছি ?

মহেন্দ্র। বন্দী করতে এসেছো—মানে ?

বিক্রমজিৎ। মানে—তোমার বাবা মহারাজের কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।

মহেন্দ্র। সেকি! বাবা—

বিক্রমজিৎ। তাই আমার উপর আদেশ হয়েছে—তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবার জন্য।

মহেন্দ্র। বিক্রমজিৎ, তুমি আমাকে—

বিক্রমজিৎ। আরে না-না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, বন্ধু হয়ে আমি কি বন্ধুকে বন্দী করতে পারি! কি—এইবার নিশ্চয়ই আপনি আমার উপর একটু সন্তুষ্ট হবেন ?

সন্ধ্যা। সন্তুষ্ট হতাম—যদি রাজার আদেশে ওকে সত্যি সত্যি বন্দী করে নিয়ে যেতেন।

মহেন্দ্র। কি—তুমি আমার বন্দিত্ব কামনা কর।

সন্ধ্যা। করতাম না, যদি তুমি মহারাজের কাছে অর্থ ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইতে, বাবাকে পায়ে ধরে ফিরিয়ে এনে আবার ধর্মপথে চলতে।

বিক্রমজিৎ। আমি একটা কথা বলছিলাম—

সন্ধ্যা। আমি ময়না নই সেনাপতি মশাই, যে আপনার মিষ্টি কথায় গলে যাবো। আমি সন্ধ্যা, তাই স্পষ্টই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি— আপনি আর কোনদিনও এ বাড়ীতে আসবেন না।

মহেন্দ্র। নিশ্চয়ই আসবে। অসুবিধা হয় বাপের বাড়ী চলে যাও।

সন্ধ্যা। ও—আমি চলে গেলে তোমার খুব সুবিধা হয়—তাই না? কিন্তু না—তা হবে না, আমি এখানেই থাকবো। তোমার খাবো, তোমার পরবো, তোমার পথেই কাঁটা হবো— [প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। সত্যি—তোমার জন্য বড় দুঃখ হয় বন্ধু! এমন স্ত্রী নিয়ে তুমি কি করে সংসার কর আমি ভেবেই পাই না।

মহেন্দ্র। হুঁ—সন্ধ্যা দেখছি খুব বেড়ে উঠেছে।

বিক্রমজিৎ। যে স্ত্রী স্বামীর কথা শোনে না—তার বিরুদ্ধাচারণ করে, আমার মতে তেমন স্ত্রীকে ত্যাগ করাই উচিত।

মহেন্দ্র। তা কি করে সম্ভব? আমি যে ওকে ধর্ম সাক্ষী করে বিয়ে করেছি!

বিক্রমজিৎ। আঃ—আবার সেই ধর্মের কথা! বলেছি না ধর্ম মেনে চললে সুখ দুঃখ আনন্দ উচ্ছ্বাস—সব কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তুমি যদি রাজী থাকো, তাহলে আমার একটি সুন্দরী শিক্ষিতা স্বাস্থ্যবতী বোন আছে—তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব।

মহেন্দ্র। তাই নাকি! আচ্ছা—তাহলে আর কিছুদিন দেখি, তারপর যা হয় একটা করা যাবে। হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি যে আমাকে বন্দী করলে না। এর জন্য মহারাজ যদি তোমাকে জবাবদিহি করে—তুমি কি বলবে?

বিক্রমজিৎ। জবাবদিহি! হাঃ-হাঃ-হাঃ, জবাবদিহি আর তিনি কোনদিনই করতে পারবেন না।

মহেন্দ্র। তার মানে!

বিক্রমজিৎ। মানে—অযোধ্যার রাজা এখন হরিশ্চন্দ্র নয়—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।

মহেন্দ্র। বিশ্বামিত্র! কি বলছো বন্ধু!

বিক্রমজিৎ। কথাটা গল্পের মত হলেও সত্যি। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে সব কিছুই দান করে দিয়েছেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কেশবের প্রবেশ।

কেশব। তবে আর কি—এবার তোমরা ধুমধাম করে বাজি বাজাও, দশহাত পুরে খাও—আর ধেই ধেই করে নাচো।

মহেন্দ্র। একি—বাবা! তুমি—

কেশব। হ্যাঁরে আমি। আমি দেখতে এসেছি—সেনাপতি কেমন

রাজার আদেশ পালন করছে। দেখতে এসেছি এতবড় একটা দুঃসংবাদে রাজ্যের সবাই যখন চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে তখন তোরা কেমন দাঁত বের করে হাসছিস!

মহেন্দ্র। আমার সামনে তুমি আসতে পারলে!

কেশব। কেন পারবো না—তোকে ভয় করি নাকি!

মহেন্দ্র। তুমি না আমার বিরুদ্ধে রাজার কাছে নালিশ করেছিলে?

কেশব। বেশ করেছি। কি করবি তুই—আমার মাথাটা কেটে নিবি? নেনা—নে—এইতো আমি গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছি—কেটে নে। যে রাজ্যে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র থাকবে না—সে রাজ্যে আমিও আর বেঁচে থাকতে চাই না।

মহেন্দ্র। বাবা—

কেশব। কি হ'ল রে—বাবা বলে দয়া করছিস নাকি! তলোয়ার তুলতে পারছিস না? ও সেনাপতি মশাই, তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমি তো জানতাম—তুমি রাজার আদেশ মানবে না। তা এইবার তোমার ঐ তলোয়ারখানা আমার গলায় বসিয়ে দিয়ে তোমার বন্ধুর একটু উপকার কর না!

বিক্রমজিৎ। না-না—আমি কেন আপনাকে হত্যা করে পাপের বোঝা মাথায় নেব?

কেশব। ও বাবা—এ যে দেখছি ভূতের মুখে রামনাম!

মহেন্দ্র। বাবা—

কেশব। না-না—আমি চলে যাচ্ছি। মহারাজ আজই বিদায় নেবেন, তাঁকে একবার শেষ দেখা দেখে আসি। ওরে হতভাগা, দেখ দেখ—সামান্য টাকার জন্যে যার সঙ্গে তুই বেইমানি করলি—সে গোটা রাজ্যটাই কেমন একজনকে দান করে দিলো।

বিক্রমজিৎ। বন্ধু, এসব পাগলামো শুনতে আমার ভালো লাগছে না।

কেশব। ঠিক বলেছো—আমি পাগল। কিন্তু তোমরা কি? তোমরা যে বাঘের চেয়ে হিংস্র, শিয়ালের চেয়ে ধূর্ত, তোমরা এক-একটা কেউটে সাপ। যে তোমাদের দুধ কলা দিয়ে পোষে—তোমরা তারই বুকে ছোবল বসিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। [স্বগতঃ] সেই ছোবল তোমাকেও একদিন খেতে হবে। [প্রকাশ্যে] কি হল বন্ধু, কি ভাবছো?

মহেন্দ্র। ভাবছি—মহারাজ হঠাৎ বিশ্বামিত্রকে সব কিছু দান করে দিলেন কেন!

বিক্রমজিৎ। সে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। মোট কথা—এতে আমাদের লাভ হয়েছে ষোল আনা।

মহেন্দ্র। কি রকম?

বিক্রমজিৎ। বিশ্বামিত্র তো ঋষি, সারাজীবন আশ্রমে কাটিয়ে জপ-তপ করছে—সে কি রাজত্ব করবে! আসলে তো রাজত্ব করবো আমরা।

মহেন্দ্র। আমরা!

বিক্রমজিৎ। হাঁ—আমি আর তুমি—তুমি আর আমি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মহেন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান।

———

অষ্টম দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদ।

সত্যসন্ধের প্রবেশ।

সত্যসন্ধ। সত্যের জয়—ধর্মের জয়, রাজা হরিশ্চন্দ্র—সত্যিই তুমি দানবীর—ধর্মবীর। একি—আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে কেন! বুকখানা এমন হাহাকার করছে কেন! না-না—এ চঞ্চলতা তো আমার শোভা পায় না। আমাকে যে পৃথিবীর মানুষকে দেখাতে হবে—যথা ধর্ম তথা জয়।

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। তাই যদি হয়, তবে কেন ধর্ম-প্রাণ রাজা হরিশ্চন্দ্রকে আজ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, আর কেনই বা অযোধ্যাবাসীর বুকে আজ শোকের পাহাড় চেপে বসেছে পূজারী?

সত্যসন্ধ। মহামন্ত্রী—

রাঘব। শুনতে পাচ্ছো না—আকাশে বাতাসে কেন ঐ করুণ সুর ভেসে আসছে! দেখতে পাচ্ছো না—হাজার হাজার প্রজা রাজপথের উপর দাঁড়িয়ে চোখের জলে সাগর বইয়ে দিচ্ছে!

সত্যসন্ধ। সব জানি—সব বুঝি মহামন্ত্রী, মহারাজের এই বিদায়ে আমার বুকখানাও যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু—

রাঘব। কিন্তুর প্রশ্ন এখন নয়। এসো, আমরা রাজ্যের সবাই এক-সঙ্গে মহারাজের পথ আগলে দাঁড়াই। তারপর দেখি—কি করে তিনি আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে যান!

সত্যসন্ধ। কোন লাভ হবে না, কিছুতেই তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হবেন না।

রাঘব। আমরা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে যাবো—দান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করবো।

সত্যসন্ধ। মহামন্ত্রী, এতদিন মন্ত্রীত্ব করেও আপনি মহারাজকে চিনতে পারেননি; কিন্তু আমি চিনেছি, তাই দৃঢ়কণ্ঠে বলছি—রাজর্ষি দান ফিরিয়ে দিতে চাইলেও মহারাজ তা ফিরিয়ে নেবেন না।

রাঘব। কেন নেবেন না; এ দানের কোন মানে হয় না। রাজর্ষি এসে সসাগরা ধরণী চাইলেন—আর মহারাজ ভ্রম বশে দান করে দিলেন—সেটাই কি সত্যি হবে?

হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। ভ্রম বশে নয় মহামন্ত্রী, সজ্ঞানে সুস্থ শরীরেই আমি তাঁকে দান করেছি।

রাঘব। কিন্তু কেন? এ দানের অর্থ কি?

হরিশ্চন্দ্র। অর্থ একটাই—তিনি অনুগ্রহ করে আমার কাছে চাইলেন, আর আমি তাঁকে দান করে ধন্য হলাম।

রাঘব। এখন যদি সেই বিশ্বামিত্রই আপনাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেয়, আপনি নেবেন না?

হরিশ্চন্দ্র। অসম্ভব! শুধু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কেন—আপনি, রাজ্যের সমস্ত প্রজা, এমন কি শৈব্যা—রোহিতাশ্ব—সকলে একত্রিত হয়ে যদি আমাকে অনুরোধ করে—সবাইকে আমি বর্জন করবো—তবু দান ফিরিয়ে নেবো না।

সত্যসন্ধ। কি হল মহামন্ত্রী, আমার কথার সত্যতার প্রমাণ পেলেন তো?

রাঘব। মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। দোহাই মহামন্ত্রী, ঐশ্বর্যের অক্টোপাস থেকে ঈশ্বর যখন আমাকে একবার মুক্তি দিয়েছেন, তখন আপনারা আমাকে আর এ বাঁধনে বাঁধতে চাইবেন না! এ যে কত শান্তির—কত আনন্দের তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না।

রাঘব। বুঝলাম—আপনি না হয় রাজত্ব চান না, কিন্তু কুমার রোহিতাশ্বের কথা একবার ভেবে দেখেছেন? পিতা হয়ে কোন প্রাণে তার কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি তুলে দেবেন?

দীনবেশে শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। তাতে কি হয়েছে দাদু, বাবা মা সঙ্গে থাকলে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

রাঘব। দাদু—দাদু ভাই, ওরে—একি বেশে তুই আমার সামনে এলি! [জড়িয়ে ধরে]

শৈব্যা। মহারাজ!

হরিশ্চন্দ্র। প্রস্তুত হয়েই এসেছো শৈব্যা?

শৈব্যা। হ্যাঁ মহারাজ—।

রোহিতাশ্ব। বাবা, এখুনি আমরা চলে যাবো?

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ বাবা, সূর্যাস্তের পূর্বেই—আমাদের প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে।

রাঘব। দেখেছো—দেখছো পূজারী, সূর্য যার কোনদিন মুখ দেখতে পায়নি—সেই সূর্য-কুলবধূ রাজরানী শৈব্যা, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, কুমার রোহিতাশ্ব কেমন ভিখারীর বেশে রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে—দেখেছো!

শৈব্যা। শান্ত হোন বাবা, এ সবই ভগবানের ইচ্ছা। তিনি যা করেন—মঙ্গলের জন্যেই করেন।

রাঘব। মঙ্গলের জন্যেই করেন!

রোহিতাশ্ব। হ্যাঁ দাদু, সত্যসন্ধ দাদাও আমাকে সেই কথা বলে। তাই না সত্যসন্ধ দাদা?

সত্যসন্ধ। হ্যাঁ রোহিত, ঈশ্বর যে মঙ্গলময়।

শৈব্যা। তাই তো সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছাতেই আমরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এতে কোন দুঃখ নেই।

রাঘব। তবু তুমি একবারও এ দানের প্রতিবাদ করবে না?

শৈব্যা। তা কি পারি! আমি যে স্ত্রী—স্বামীর সহধর্মিণী, তাঁর ধর্মপথে সহযোগিতা করাইতো আমার ধর্ম।

রাঘব। বাঃ—চমৎকার বললে—চমৎকার বোঝালে।

সত্যসন্ধ। মহামন্ত্রী, এরা সবাই এক ছাঁচে ঢালা—এক সূতোয় গাঁথা—তাই একই কথা বলে।

রাঘব। ওঃ—ভগবান, এ দৃশ্য দেখার আগে কেন তুমি এই বৃদ্ধকে মৃত্যু দিলে না! কেন বিরাট ভূমিকম্পে অযোধ্যাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলে না!

হরিশ্চন্দ্র। ছিঃ-ছিঃ মহামন্ত্রী, অযোধ্যা আমার প্রাণ, অযোধ্যার প্রজা আমার সন্তান তুল্য—আমার সামনে সেই অযোধ্যার অমঙ্গল কামনা করেন!

রাঘব। অমঙ্গল কামনা! আপনার মত ধর্মপ্রাণ রাজা ভিখারীর বেশে যে রাজ্য ছেড়ে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে, সে রাজ্যের অমঙ্গলের আর কি বাকি আছে বলতে পারেন মহারাজ?

শৈব্যা। কেন এত চঞ্চল হচ্ছেন বাবা, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষি হলেও

রাজপুত্র। রাজরক্ত তাঁর শিরায় শিরায়। দেখবেন—রাজা হয়ে প্রজাদের মঙ্গলই করবেন।

রাঘব। হ্যাঁ—যেমন মঙ্গল করেছে তোমাদের। ওঃ—বিশ্বামিত্র, তুমি কি নিষ্ঠুর!

হরিশ্চন্দ্র। না-না, রাজর্ষিকে দোষারোপ করবেন না। আমি অযোধ্যার অক্ষম রাজা, তাইতো তিনি করুণা করে আমাকে সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমি বলছি, দেখবেন—আমার বিদায়ে অযোধ্যায় শান্তি ফিরে আসবে, অমঙ্গলের কালো মেঘ কেটে যাবে, প্রজারাও সুখে শান্তিতে বাস করবে।

রাঘব। থাক—থাক মহারাজ, আমাকে আর স্তোক বাক্যে ভোলাতে হবে না। আপনার পিতা মহারাজ হরিবিক্রমের মন্ত্রিত্ব করেছি, আপনারও মন্ত্রিত্ব করলাম—ইচ্ছা ছিল কুমার রোহিতাশ্বকে সিংহাসনে দেখে বানপ্রস্থে যাবো। ভগবান সে সাধ আমার এমনি ভাবেই পূর্ণ করলেন!

শৈব্যা। কাঁদবেন না বাবা—কাঁদবেন না, এইভাবে চোখের জল ফেলে আমাদের যাত্রাপথ পিছল করে দেবেন না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন—সব হারিয়েও আমরা যেন শুধু ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি।

রাঘব। তোমরা বড় নিষ্ঠুর—বড় নির্মম, দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলবো—তাও তোমরা ফেলতে দেবে না।

রোহিতাশ্ব। দাদু—

রাঘব। আয় দাদু—আয়, আর একবার তোকে ভালো করে দেখে নিই—বুকের মধ্যে তোর ছবিখানা এঁকে নিই।

সত্যসন্ধ। ওঃ—বৃদ্ধের এই মর্মবেদনা আর সহ্য করা যায় না। এখন এ স্থান ত্যাগ করাই উচিত, নইলে আমিও হয়তো—

হরিশ্চন্দ্র। সত্যসন্ধ, তুমিও—

সত্যসন্ধ। না-না মহারাজ, আমি কিন্তু মহামন্ত্রীর মত এত ভেঙে পড়িনি। আপনাদের এই বিদায়ের দৃশ্য দেখে আমার যত দুঃখ হচ্ছে—তার চেয়ে বেশী দুঃখ হচ্ছে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের জন্যে।

রাঘব। কি বললে—রাজর্ষির জন্যে তোমার মনে দুঃখ হচ্ছে!

সত্যসন্ধ। হবে না! মহারাজ তো দানধর্ম রক্ষা করে মঙ্গল লাভের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছেন, কিন্তু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র—সারাজীবনের সাধনায় তিল তিল করে যে অমৃতের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেছিলো—এক মুহূর্তের ভুলে সে ভাণ্ডার যে তার একেবারে শূন্য হয়ে গেল!

হরিশ্চন্দ্র। সত্যসন্ধ—

সত্যসন্ধ। ধন্য—ধন্য মহারাজ, ধন্য আপনার জীবনের আদর্শ, সার্থক আপনার দানবীর নাম। জগতের বুকে আজ আপনি যেভাবে ধর্মের মান উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন—দেবতারাও বোধহয় কোনদিন তা করতে পারেনি—পারবেও না— [প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। মহামন্ত্রী, আর তো আমরা দেরী করতে পারি না; এই-বার আমাদের বিদায় দিন!

রাঘব। হ্যাঁ-হ্যাঁ ধরে যখন রাখতে পারবোই না—তখন বিদায় তো দিতেই হবে। কিন্তু তার আগে বলে যান—এই বৃদ্ধ কি নিয়ে বেঁচে থাকবে?

হরিশ্চন্দ্র। ধর্ম নিয়ে। সারাজীবন তো কাজের মধ্য দিয়েই কাটালেন, বাকী জীবনটা ঈশ্বরের নাম করে কাটিয়ে দিন—শান্তি পাবেন। রোহিত, দাদুকে প্রণাম কর!

রোহিতাশ্ব। দাদু—[রাঘবকে প্রণাম করে]

রাঘব। আশীর্বাদ করি—মায়ের কোল জোড়া হয়ে বেঁচে থাক—

বংশের নাম উজ্জ্বল কর! ওঃ—ভগবান, শেষ বয়সে এতবড় আঘাত দেবে বলেই কি তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছো! মৃত্যু দাও ঠাকুর—মৃত্যু দাও।

রোহিতাশ্ব। মা, এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে! আমার খেলা ঘর—আমার বন্ধুবান্ধব—

শৈব্যা। ছিঃ রোহিত, চোখের জল ফেলতে নেই, তাহলে যে তোমার পিতার দানের অমর্যাদা হবে!

রাঘব। মা শৈব্যা—

শৈব্যা। আশীর্বাদ করুন বাবা, সুখে দুঃখে আমি যেন চিরদিন স্বামীর পাশেই থাকতে পারি। স্বামীর ধর্ম রক্ষার জন্য জীবন দিতেও যেন কোনদিন কুণ্ঠিত না হই।

রাঘব। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আশীর্বাদ করি মা, তুমি প্রাতঃস্মরণীয় হও। সতী শৈব্যার পতি ভক্তির কাহিনী যেন সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকে।

হরিশ্চন্দ্র। এসো শৈব্যা, ঐ দেখ সূর্যদেব পশ্চিমে চলে পড়েছে। আর বেশী দেরী করলে যে আমার সত্য ভঙ্গ হয়ে যাবে।

রোহিতাশ্ব। রাজ্য ছেড়ে আমরা কোথায় যাবো বাবা?

হরিশ্চন্দ্র। অসীম অনন্ত পথের যাত্রী আমরা, আমাদের কি চলার শেষ আছে বাবা! সসাগরা ধরণী দান করে দিয়েছি, জানি না কোথায় যাবো—কোথায় হবে আমাদের উপযুক্ত স্থান।

দেবদূতের প্রবেশ

দেবদূত। বারাণসী ধাম।

সকলে। বারাণসী ধাম!

দেবদূত। হ্যাঁ মহারাজ, মহেশ্বরের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত এই

বারাণসী ধাম। এ স্থান শুধু আপনার রাজ্য নয়—পৃথিবীর সীমারেখারও বাইরে। তাই সেখানেই আপনাদের উপযুক্ত স্থান।

শৈব্যা। তুমি—তুমি—

দেবদূত। আমি গো মা আমি—আমাকে চিনতে পারলে না! সেই ভবঘুরে ছেলে দেবদূত। বলেছিলাম না—মানুষ যখন পথ হারায় তখন আমি তাদের পথের সন্ধান দিই। তাই তো তোমাদেরও পথের সন্ধান দিতে ছুটে এলাম!

হরিশ্চন্দ্র। দেখো—দেখো শৈব্যা, দেখুন মহামন্ত্রী, ঈশ্বর আছেন। তাঁর করুণা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেননি। তাই তো ঠিক সময়ে উপযুক্ত পথের সন্ধান দিয়ে পাঠিয়েছেন। এসো শৈব্যা, আয় রে রোহিত—এবার আমরা ঐ আলোর পথেই যাত্রা শুরু করি।

রাঘব। মহারাজ—মহারাজ—

হরিশ্চন্দ্র। মঙ্গল কর মঙ্গলময়! সব অমঙ্গলের বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে অযোধ্যার তুমি মঙ্গল কর। আমার প্রজাদের তুমি সুখী কর—তাদের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তোল!

দেবদূত।— গীত।

এসো পাগলাভোলার পাগলাছেলে বিশ্বনাথের পায়।
সেথা বিশ্বেশ্বর হাত বাড়িয়ে তোমারই আশায়।
[তুমি] যে ত্যাগের মহিমা করিলে প্রচার—
ভুবনে তুলনা হয় না তাহার
আজনম এ আকাশ-বাতাস স্মরণে রাখিবে তায়।
তুমি সত্য সুন্দরের পূজারী
মানব তুচ্ছ, দেবতা যুক্ত কীর্তি স্মরিয়া তোমারি।
তাই বিশ্বনাথ ডাকছে তোমায় হাতের ইশারায়।

[গীত শেষে রাঘব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাঘব। দাদু—মা শৈব্যা—মহারাজ—

সকলে। [নেপথ্যে] বিদায়—বিদায়—বিদায়—

রাঘব। প্রলয়—প্রলয়—অযোধ্যার বুকে আজ মহাপ্রলয় হয়ে গেল। কাল-রাহু অযোধ্যার সূর্য্যকে গ্রাস করে নিলো। ওঃ—ঋষি বিশ্বামিত্র—না-না—তুমি ঋষি নও—তুমি চণ্ডাল—তুমি চণ্ডালেরও অধম—

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

সরযূর তীর।

কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। এগিয়ে চলেছি—এগিয়ে চলেছি, জয়ের নিশান হাতে এগিয়ে চলেছি। যেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছি—সেই দিকেই অধর্ম আর কুমতির জয়। এইবার দেখবো—ধর্ম আর সুমতি কি করে তোমরা সৃষ্টির বুকে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ কর।

দেবানিকের প্রবেশ।

দেবানিক। নমস্কার—ডাকিনী—নাগিনী—প্রেতিনী দেবী! অনেক-দিন পরে দেখা হল। তা ভালো আছো তো?

কুমতি। একি—তুমি এখানে!

দেবানিক। এসেছিলাম সরযুতে স্নান করতে। তাই দূর থেকে

তোমাকে দেখতে পেয়ে সেই গায়ে পড়া প্রাণ জ্বালানো প্রেমটাকে একটু ঝালিয়ে নিতে এলাম।

কুমতি। এ্যা—তাই নাকি! এতদিন পরে সত্যিই তুমি আমার প্রেমের ডাকে—

দেবানিক। আরে-রে—কাছে আসছো কেন! দূরে দাঁড়িয়ে কথা বল, নইলে আবার আমাকে নাইতে হবে।

কুমতি। নাইতে হবে কেন প্রিয়তম?

দেবানিক। তুমি যে নরকের কীট প্রাণেশ্বরী—

কুমতি। কি—আমি নরকের কীট!

দেবানিক। তবে কি সগ্‌গের দেবী! ও কথায় গুরুদেব ভুললেও এ ভবি ভুলবে না। এখন সার কথা বলতো, এই অসময়ে এই সরযুর তীরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? আবার কার কাঁধে চেপে ঘাড় মটকে রক্ত খাওয়ার ধান্দা করছো?

কুমতি। রক্ত খাওয়ার ধান্দা করছি—মানে?

দেবানিক। মানে—একবার তো আমার গুরুদেবকে ভগবান হবার যুক্তি দিয়ে গাছে তুলে দিলে। তারপর তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ধর্মপ্রাণ রাজাকে রাজ্য ছাড়া করলে। এবার আর কোন মুনি ঋষির সর্বনাশের জন্যে এখানে ওৎ পেতে বসে আছো—শুনি?

কুমতি। বাজে কথা বল না, আমি কারও সর্বনাশ করি না। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আমার কথা শুনে চলেছিলো বলেই আজ সে রাজা হয়ে বসেছে।

দেবানিক। একজনের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে কি দরকার ছিল তার রাজা হবার?

কুমতি। ভালোই তো করেছে। সে যেমন তার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল তেমন উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে।

দেবানিক। থামো—থামো, রাজার কোন দোষ নেই—যত দোষ করেছো তুমি। কি বলবো—গুরুদেব যে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে গেছে। তাই তোমার কথায় বিশ্বাস করে ভালমন্দ বিচার করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। নইলে এতবড় একটা ঋষি—এমন সুন্দর সাধন ভজন শিকেয় তুলে দিয়ে রাজা হয়ে বসে!

কুমতি। দোষ কি! সাধন ভজনের মধ্যে থেকে কি হবে? শুধু হত্তুকী আর কাঁচকলা খাবে! তার চেয়ে রাজা হয়ে সুখে জীবন কাটানো অনেক ভালো।

দেবানিক। আচ্ছা—তুমি এক মুখে কত রকম কথা বল?

কুমতি। কেন?

দেবানিক। একবার বলছো—সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল বলে রাজাকে শাস্তি দিয়ে ভাল করেছে। আবার বলছো—সাধন ভজন করে কি হবে, তার চেয়ে রাজা হওয়া অনেক ভাল। কোনটা তোমার সত্যি কথা বলতো দেখি নরকেশ্বরী দেবী?

কুমতি। আবার গালাগালি দিচ্ছো?

দেবানিক। তবে কি ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করবো নাকি! এখনও ভাল কথা বলছি—আর কারও ঘাড়ে চাপার চেষ্টা কর না। যে নরক থেকে উঠে এসেছো সেখানে গিয়েই মরগে যাও। নইলে তোমার চরিত্রের কথা আমি সবাইকে বলে দেবো—তোমার পিছনে কুত্তা লেলিয়ে ছাড়বো।

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রমজিৎ। এই—কে তুমি? কেন ঐ ভদ্র মহিলাকে অপমান করছো?

সেবানিক। ওর বাপ-চৌদ্দ-পুরুষ কথনও ভদ্র মহিলা ছিল না।—

বিক্রমজিৎ। থামো!

সেবানিক। ও বাবা—এ যে দেখছি বিরাট বপু—চকচকে পোষাক, আপনি—

বিক্রমজিৎ। এ রাজ্যের সেনাপতি।

সেবানিক। সেনাপতি! নমস্কার! সেনাপতি মশাই, শিগ্‌গির একে বেঁধে নিয়ে কারাগারে আটকে রাখুন। ও বড় সাংঘাতিক মেয়ে-ছেলে। আস্ত আস্ত মানুষের মাথা চিবিয়ে খায়, ছেলে—বুড়ো—মুনি—ঋষি—কিছু বাদ দেয় না। সুযোগ পেলে আপনাকেও হয়তো ওষুধের বাড়র মত টপাস করে গিলে ফেলবে—সাবধান!

[প্রস্থান।

উভয়ে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিক্রমজিৎ। তোমার উপর বড্ড ক্ষেপে আছে দেখছি, ধরে ফেলেছে নাকি?

কুমতি। ওর ধরে ফেলা না ফেলায় কিছু যায় আসে না। ওতো একটা চুনোপুটী—বিশ্বামিত্রের শিষ্য।

বিক্রমজিৎ। ও—বিশ্বামিত্রের শিষ্য! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কুমতি। এইবার বল—তোমার খবর কি?

বিক্রমজিৎ। তুমি যার স্ত্রী—তুমি যার সহায়—তার খবর কি খারাপ হতে পারে নাকি! রাজ্যের মধ্যে আমি ব্যাপকভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছি, অর্দ্ধেক প্রজা আমার হাতের মুঠোয় এসেছে, তারা অধর্মের পথ বেছে নিয়েছে। ঋষি বিশ্বামিত্র এখন জপ তপ ছেড়ে দিয়ে রাজ্য নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

কুমতি। জয় তাহলে আমাদের হবেই!

বিক্রমজিৎ। হবে কি—হয়ে বসে আছে। এখন শোন, হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী পুত্র নিয়ে বারাণসী গেছে; তোমাকেও আজ সেখানে যেতে হবে।

কুমতি। আমি বারাণসী যাবো! কেন?

বিক্রমজিৎ। সেখানে গিয়ে একটা মায়া অট্টালিকা সৃষ্টি করে নতুন খেলা খেলতে হবে।

কুমতি। কি সে নতুন খেলা!

বিক্রমজিৎ। এখুনি এখানে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তপস্যা করতে আসবে। তুমি তাকে তোমার মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে বিয়ে করবে। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে বারাণসীতে যাবে। তারপর—

কুমতি। কি বলছো তুমি—যার মনে কামনা নেই, দেহে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা নেই—সেই বৃদ্ধ তপস্বীকে আমি বিয়ে করবো!

বিক্রমজিৎ। নইলে যে ধর্মের দম্ভ চূর্ণ হবে না, আর যে হরিশ্চন্দ্র ধর্ম ছাড়া কিছু জানে না—তার উপরও প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

কুমতি। প্রতিশোধ!

বিক্রমজিৎ। হ্যাঁ। আমাদের বিজয় রথের চাপে নিষ্পেষিত করতে হবে ধর্মের অস্তিত্ব। হরিশ্চন্দ্র আর শৈব্যার মন থেকে চিরদিনের মত মুছে দিতে হবে ধর্মের নাম গান, তবেই হবে আমাদের পরিপূর্ণ জয়।

কুমতি। বেশ, আমি প্রস্তুত।

বিক্রমজিৎ। সাবাস—এই তো চাই—এই তো তোমার উপযুক্ত কথা। ঐ দেখ সেই ব্রাহ্মণ এদিকে আসছে, চল আড়ালে গিয়ে তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলছি। তারপর কার্যোদ্ধার হলে আমি বারাণসীতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তীর্থনাথের প্রবেশ।

তীর্থ। ওঁ ধ্যায় সদা সৌবিত্রী মণ্ডল মধ্যবর্তী সরসীজাম সন্নিবিষ্ট কেয়ূর্বান কনক কুণ্ডলবান কিরিটীহারী হিরণ্ময়বপু ধৃত শঙ্খ চক্র।

বিক্রমজিৎ ও কুমতির প্রবেশ। কুমতিকে ইঙ্গিতে তীর্থনাথকে দেখিয়ে বিক্রমজিতের প্রস্থান।

ওঁ নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

[প্রণাম করে—কুমতি তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়]

তীর্থ। একি—কে—কে তুমি! কেন তুমি আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলে!

কুমতি। আমি প্রভু, তোমার শ্রীচরণের দাসী—মালবিকা।

তীর্থ। কি বলছো নারী!

কুমতি। ঠিকই বলছি। আমার এই দেহ মন সব কিছুই আজ থেকে তোমার পায়ে সঁপে দিলাম। আজ থেকে তুমিই মালবিকার স্বামী।

তীর্থ। স্বামী! ছিঃ-ছিঃ, কাকে কি বলছো! আমি সংসার ত্যাগী ব্রাহ্মণ—

কুমতি। জানি প্রভু—সব জানি, তবু আমি দেবতার আদেশে তোমাকেই বরণ করতে বারাণসী থেকে এখানে ছুটে এসেছি।

তীর্থ। দেবতার আ'দেশে আমাকে বরণ করতে বারাণসী থেকে—এ সব কি বলছো তুমি! তুমি কি উন্মাদিনী!

কুমতি। উন্মাদিনী আমি নই প্রভু—যা বলছি সব সত্যি।

তীর্থ। সত্যি!

কুমতি। হাঁ প্রভু, আমি বারাণসীতে থাকি। বাড়ী ঘর টাকা পয়সা—কোন কিছুতেই আমার অভাব নেই। বাবা বিশ্বনাথের নাম নিয়ে মহাসুখে আমার জীবন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু লোকে বলে—স্বামী ছাড়া নারী জীবনের কোন মূল্য নেই। স্বামীর সেবাই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে নারী সেই সেবা থেকে বঞ্চিত, তার দেহ অশুদ্ধ—জন্ম বৃথা।

তীর্থ। বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে আমার কাছে কেন?

কুমতি। বললাম তো—দেবতার আদেশ। উপযুক্ত স্বামী নির্বাচনের আশায় আমি তিনদিন তিনরাত বিশ্বনাথের চরণে ধর্ণা দিয়েছিলাম। তারপর দেবতা আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, আমি তোর পূজোয় সন্তুষ্ট হয়েছি। যা—অমুক দিনে অমুক সময়ে সরযূর তীরে এক ব্রাহ্মণ সাধনা করতে আসবে। সেই তোর উপযুক্ত স্বামী, তাকেই স্বামীরূপে বরণ কর।

তীর্থ। তুমি ভুল করেছো নারী, দেবতা আমার কথা বলেনি। আমি ছাড়া এখানে অনেক যুবকও সাধনা করতে আসে, তাদের মধ্যে কেউ হয়তো তোমার উপযুক্ত স্বামী হবে। দেখছো না আমি বৃদ্ধ হয়েছি, বয়সের ভারে দেহ নুয়ে পড়েছে।

কুমতি। তাতে কি হয়েছে, বৃদ্ধ ভোলানাথও তো ন-বছরের গৌরীকে বিবাহ করেছিলেন।

তীর্থ। দেবতা কখনও বৃদ্ধ হয় না।

কুমতি। না-না প্রভু, আমাকে তুমি ভোলাতে চেষ্টা কর না। আমি জানি—দেবতার আদেশ মিথ্যে হতে পারে না, আমার নির্বাচনও ভুল হয়নি—তুমি—তুমিই আমার উপযুক্ত স্বামী।

তীর্থ। তা হয় না নারী। সারাজীবন আমি সাধন ভজন নিয়ে

কাটিয়েছি, আজ এই বৃদ্ধ বয়সে কিছুতেই সংসারের মধ্যে পা দিতে পারবো না।

কুমতি। কেন পারবে না! মহর্ষি বশিষ্ঠ, ঋষি বিশ্বামিত্র—এরাও তো বিবাহ করেছিলেন।

তীর্থ। করেছিলেন—তবে বৃদ্ধ বয়সে নয়। কথা শোন—ফিরে যাও অন্য কোন যুবককে বিবাহ করে সুখী হও।

কুমতি। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—তুমি আমাকে দ্বিচারিণী হতে বলছো প্রভু!

তীর্থ। দ্বিচারিণী হতে বলছি!

কুমতি নয়তো কি? তুমি না শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তুমি না দেবতার আরাধনা কর! তবে বল—একবার একজনের গলায় যে মালা পরিয়ে দিয়েছি, যার পায়ে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছি—তা আর একজনকে দিলে কি লোকে দ্বিচারিণী বলে না?

তীর্থ। কেন তুমি অবুঝ হচ্ছো নারী? বুঝে দেখ—আমি সাধক।

কুমতি। বুঝেছি, আমাকে বিয়ে করলে তোমার সাধনায় বিঘ্ন হতে পারে—এইতো! না-গো-না—আমি তোমার সাধনায় বাধা সৃষ্টি করবো না। আমি শুধু তোমার সেবা করেই আমার জীবন ধন্য করতে চাই।

তীর্থ। কিন্তু আমি যে—

কুমতি। এখনও এত দ্বন্দ্ব! এখনও তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না! তাহলে আর এ প্রাণ রেখে লাভ কি, মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র পথ।

তীর্থ। এ তুমি আমায় কি পরীক্ষায় ফেললে ঠাকুর! বল—বল, এখন আমি কি করবো—কোন পথে যাবো!

সুমতি। প্রণাম নাও ঠাকুর, তুমি স্বীকার না করলেও আমি জানি—তুমিই আমার স্বামী, আমার দেবতা। তাই তোমার নাম স্মরণ করে আমি এখুনি ঐ সরযূর জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবো।

[প্রস্থানোদ্যত]

তীর্থ। সেকি—আত্মহত্যা করবে!

সুমতি। তোমার পায়ে যখন আমাকে ঠাঁই দিলে না, তখন আর এ জীবনের কোন মূল্য নেই। তাই আত্মহত্যা করেই আমি আমার সব জ্বালা শেষ করে দেবো।

[প্রস্থান।

তীর্থ। ফিরে এসো—ফিরে এসো নারী, আত্মহত্যা মহাপাপ। আমি তোমাকে গ্রহণ করবো, ফিরে এসো—ফিরে এসো।

[প্রস্থান।

———

একাদশ দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদ।

রাজদণ্ড ও মুকুট হাতে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। এক হরিশ্চন্দ্রের জন্যে রাজ্যের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে—একা আমি কোনদিক সামলাবো! অথচ বিক্রমজিৎ আর মহেন্দ্র ছাড়া আর কোন রাজকর্মচারীই আমাকে রাজকার্যে এতটুকু সহযোগিতা করছে না। এদিকে দিন-রাত প্রজাদের অভিযোগ শুনতে শুনতে আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

রাঘব রায়ের প্রবেশ ।

রাঘব। সেকি রাজর্ষি, এরই মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছো! এই তো সবে শুরু।

বিশ্বামিত্র। এই যে রাঘব রায়, তুমি তো এতদিন হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব করেছো, তবে আমার মন্ত্রিত্ব করতে আপত্তি করছো কেন?

রাঘব। হরিশ্চন্দ্রের মন্ত্রিত্ব করেছি বলে যে তোমারও মন্ত্রিত্ব করতে হবে এমন তো কোন শর্ত নেই রাজর্ষি।

বিশ্বামিত্র। শর্তের কথা নয়—করবে না কেন তাই বল?

রাঘব। আমার খুশি। মন্ত্রিত্ব করা না করা—সেটা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তার জন্য কাউকে জবাবদিহি করবো না।

বিশ্বামিত্র। মনে রেখো কার সামনে তুমি কথা বলছো—আমি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র!

রাঘব। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে আমি মাথায় তুলে রাখতে পারি, তাঁর পায়ে কাঁটা ফুটলে আমি দাঁত দিয়ে তুলে দিতে পারি, কিন্তু যে ঋষি রাজ্য-লিপ্সায় অন্ধ হয়ে অমন ধর্মপ্রাণ রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসেছে—তাঁর মন্ত্রিত্ব রাঘব রায় করবে না।

বিশ্বামিত্র। রাঘব রায়—

কেশবের প্রবেশ।

কেশব। প্রণাম হই মহারাজ, শরীর-টরীর ভালো আছেন তো?

বিশ্বামিত্র। যাও—যাও—এখন অভিযোগ শোনার সময় নেই।

কেশব। আমি অভিযোগ করতে আসিনি মহারাজ।

বিশ্বামিত্র। তবে কেন এসেছো?

কেশব। রাজ-দর্শন করে ধন্য হতে এসেছি।

বিশ্বামিত্র। আগন্তুক—

কেশব। তা কই মাথায় মুকুট দেননি কেন? রাজ-পোষাক পরেননি কেন?

বিশ্বামিত্র। এত স্পর্দ্ধা তোমার— আমার সঙ্গে রহস্য কর!

কেশব। রহস্য! আরে ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—আমি কি আপনার সঙ্গে রহস্য করতে পারি! আপনি যে কাঁচা খেকো দেবতা—এখুনি হয়তো আমাকে ফট করে ভস্ম করে দেবেন। তা করুন—তাতে আমার আপত্তি নেই, তবে যাই বলুন আর তাই বলুন—কাজটা কিন্তু আপনি মোটেই ভালো করেননি।

বিশ্বামিত্র। ভালো করি আর মন্দ করি—তোমায় উপদেশ দিতে হবে না, তুমি যাও।

রাঘব। এ শুধু এর একার কথা নয় রাজর্ষি, প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে শুনে এসো—একদিন যারা তোমার নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করতো, তোমার জয় গানে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিতো—আজ তারাই তোমার নিন্দায় শতমুখ হয়ে উঠেছে।

দেবানিকের প্রবেশ।

দেবানিক। পায়ের ধুলো দিন গুরুদেব, রাজা হয়ে খুব সুখেই আছেন দেখছি।

বিশ্বামিত্র। দেবানিক, তুইও আমাকে বিদ্রূপ করছিস!

দেবানিক। বিদ্রূপ নয় গুরুদেব, সত্যি কথাই বলছি। সেদিন এত করে নিষেধ করলাম—এখানে আসবেন না, রাগটা একটু দমন করুন—কিন্তু শুনলেন কি সে কথা! সেই লজ্জার মেয়েটার কথায় ভেলে-বেভুলে

জলে উঠে ছুটে এসে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসলেন। এখন বুঝুন! কথায় বলে—যার কাজ তারই সাজে—অপরের লাঠি বাজে।

বিশ্বামিত্র। চুপ কর মূর্খ!

দেবানিক। আমি তো মূর্খ একশোবার, কিন্তু আপনার মত পণ্ডিত-লোক যে এত বড় একটা ভুল করলো কেন—সেইটাই আমি বুঝতে পারছি না।

বিশ্বামিত্র। ভুল—ভুল—ভুল—সবাই বলছে আমি ভুল করেছি। কিন্তু আমার সারা জীবনের সাধনা পণ্ড করে হরিশ্চন্দ্র যে কত বড় অন্যায় করলো—সে কথাটা তো কেউ একবারও বলছো না! কেন—কিসের এত দর্প তার, কেন সে একবার আমার কাছে ক্ষমা চাইলো না! তাহলে কি আমি তার কাছে রাজ্য ভিক্ষা চাইতাম?

রাঘব। তোমার বিচারে সে অপরাধী হলেও তার বিচারে সে তো অপরাধী নয়। সে তার রাজধর্ম রক্ষা করেছে—সুতরাং ক্ষমা সে চাইবে কেন?

বিশ্বামিত্র। তাই যদি হয়—তাহলে সেই শাস্তি দিয়ে আমিও কোন অন্যায় করিনি।

কেশব। করেছেন—ঠাকুর করেছেন। আপনারই জন্যে আজ প্রজাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সকলেই বলছে—রাজ্যের লোভে আপনি একেবারে অন্ধ হয়ে গেছেন। তাই—

বিশ্বামিত্র। যারা বলে তারা জানে না—রাজ্য আমারও ছিল, আমিও মহারাজ গাধীর পুত্র। সব কিছু ধূলোমুঠির মত ত্যাগ করে দিয়ে সাধন-ভজন নিয়ে সারাজীবন কাটিয়েছি।

রাঘব। অথচ সেই সর্বত্যাগী ঋষিই আজ সাধন-ভজন ছেড়ে দিয়ে রাজ্য নিয়ে মেতে আছো—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

বিশ্বামিত্র। মন্ত্রী—

কেশব। ঋষি ঠাকুর, আমি আপনার পায়ে ধরে বলছি—আমাদের দয়ালু রাজাকে ফিরিয়ে এনে দিন। তাঁর অভাবে রাজ্যটা একেবারে শ্মশান হতে বসেছে।

বিশ্বামিত্র। তুমি কি এই কথাই বলতে এসেছো ?

দেবানিক। আমিও অনুরোধ করছি গুরুদেব, কি হবে এই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করে, রাজ্যসুদ্ধ লোকের নিন্দে কুড়িয়ে ! তার চেয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে ফিরিয়ে আনুন, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে রাজ্যটা তাকে ফিরিয়ে দিন।

বিশ্বামিত্র। কি—অপরাধ করলো সে—আর ক্ষমা চাইবো আমি !

মাধব। তাতে তোমার সম্মান বাড়বে ছাড়া কমবে না ঋষি।

কেশব। রাজ্যের সবাই তোমাকে কাঁধে করে নাচবে—ধন্যি ধন্যি করবে।

বিশ্বামিত্র। তা আমিও জানি। আমি সংসার ত্যাগী ঋষি, রাজ্য-লিপ্সা আমার কোনদিনও ছিল না—আজও নেই। এখুনি আমি হরিশ্চন্দ্রকে সবকিছু ফিরিয়ে দিতে পারি—যদি একবার সে আমার কাছে ক্ষমা চায়।

মাধব। অপরাধ সে করেনি—ক্ষমাও সে চাইবে না।

বিশ্বামিত্র। তবে আর কি করবো, আমি আমার সংকল্পে অটুট। প্রয়োজন হলে এ রাজ্যটাকে আমি অন্য কাউকে দান করে দেবো—তবু হরিশ্চন্দ্রকে নয়।

দেবানিক। গুরুদেব, আপনার এই বিদ্‌ঘুটে ক্রোধ রিপুটাকে একটু দমন করুন। নইলে যে আপনার সারাজীবনের সাধনা একেবারে পণ্ড হতে বসেছে।

বিশ্বামিত্র। তার জন্য ঐ হরিশ্চন্দ্রই দায়ী। সেই আমার ত্রিবিদ্যা সাধন ব্যর্থ করে দিয়েছে। নইলে—

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রমজিৎ। আজ যদি আপনি ত্রিবিদ্যা সাধন সম্পন্ন করতে পারতেন—তাহলে ভগবান হয়ে যেতেন।

কেশব। একে মনসা—তায় আবার ধূনোর গন্ধ!

দেবানিক। আপনিও যে দেখছি সেই মেয়েটার মত ত্রিবিদ্যা সাধনের কথা বলে গুরুদেবকে উসকে দিচ্ছেন!

বিশ্বামিত্র। ত্রিবিদ্যা সাধন—হ্যাঁ-হ্যাঁ আবার আমি ত্রিবিদ্যা সাধন করবো।

বিক্রমজিৎ। সেজন্যে কোন চিন্তা করবেন না প্রভু, আমি প্রহরায় নিযুক্ত থেকে আপনার ত্রিবিদ্যা সাধন সম্পন্ন করে দেব। কিন্তু তার আগে আপনাকে বারাণসীতে যেতে হবে।

বিশ্বামিত্র। বারাণসী! কেন?

বিক্রমজিৎ। হরিশ্চন্দ্রের কাছ থেকে দানের দক্ষিণা নিতে।

বিশ্বামিত্র। ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ, কথাটা আমি ভুলেই গেছি, তুমি ঠিক সময়মত মনে করিয়ে দিয়েছো।

রাঘব। বাঃ—চমৎকার বিক্রমজিৎ—চমৎকার তোমার কৃতজ্ঞতা!

বিক্রমজিৎ। আপনার কৃতজ্ঞতা নিয়ে আপনি থাকুন, আমি এখন রাজর্ষির দাসানুদাস।

রাঘব। তাতো এখন বলবেই। একদিন যে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সম্মান দিয়েছিলেন—সে কথাতো এখন ভুলে যাবেই!

বিশ্বামিত্র। দেবানিক, তুই আশ্রমে ফিরে যা, আমি আজই বারাণসীর পথে যাত্রা করবো।

দেবানিক। দোহাই গুরুদেব, আর এগোবেন না, এখানেই ক্ষান্ত হোন। অনেক নিষ্ঠুরতা তো দেখিয়েছেন—আর কেন! এতে পাপের বোঝা বাড়বে ছাড়া কমবে না।

বিশ্বামিত্র। দেবানিক—

কেশব। ঋষি ঠাকুর, সব কিছু ফেলে তাঁরা এক কাপড়ে চলে গেছে। জানি না—কি করে তাঁদের দিন কাটছে, হয়তো না খেতে পেয়ে পথে পথে ঘুরছে—আপনি আর তাঁদের জ্বালাতন করতে যাবেন না। দোহাই ঠাকুর, আমাদের একটা কথা রাখুন—আপনার পায়ে ধরে বলছি।

বিক্রমজিৎ। এদের কারও কথায় কান দেবেন না রাজর্ষি, দক্ষিণা ছাড়া এ দান যে অসিদ্ধ!

বিশ্বামিত্র। তুমি ঠিকই বলেছো।

রাঘব। ঋষি, রাজ্য ঐশ্বর্য সবইতো তাদের কেড়ে নিয়েছো, মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিতে যেওনা। তাহলে জগতের লোক তোমার এই নিষ্ঠুরতার কথা শুনে ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে—আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

বিশ্বামিত্র। উঠুক—তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তবু আমি দেখতে চাই—কেমন করে সে দানের মর্যাদা রাখে, আর কি ভাবেই বা আমাকে দক্ষিণা দেয়।

কেশব। তোমার মাথায় বাজ পড়ুক, তুমি মুখে রক্ত উঠে মর, শ্যাল শকুনে তোমার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক—আমরা সব হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। মূর্খ—জানে না—ওর অভিশাপে আমার কিচ্ছু হবে না।

বিক্রমজিৎ। একটা চাষী আপনাকে অভিশাপ দিয়ে গেল আর আপনি কিছু বললেন না!

বিশ্বামিত্র। না। কারণ—সামান্য একটা শূদ্র আমার ক্রোধের পাত্র নয়। তাই অব্যাহতি দিলাম। আমার লক্ষ্য—শুধু হরিশ্চন্দ্র।

রাঘব। ঋষি, দক্ষিণা যদি তোমার এতই প্রয়োজন—তবে হরিশ্চন্দ্রের হয়ে আমিই তোমাকে দক্ষিণা দেবো।

বিশ্বামিত্র। তুমি দেবে—!

রাঘব। হ্যাঁ ঋষি। সারাজীবন ধরে আমি যে অর্থ উপার্জন করেছি, সব—সব তোমার হাতে তুলে দেবো; বিনিময়ে তুমি হরিশ্চন্দ্রকে ঋণ থেকে মুক্তি দাও।

বিশ্বামিত্র। না—আমি চাই হরিশ্চন্দ্রের উপার্জিত অর্থ।

রাঘব। ওঃ—ঋষি, তুমি কি নিষ্ঠুর—কি নির্মম! তুমি দেবতা না দানব, ঋষি না চণ্ডাল! না-না, কারো সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না—তোমার তুলনা শুধু তুমি নিজেই।

বিশ্বামিত্র। মন্ত্রী রাঘব রায়—!

রাঘব। একটা কথা শুনে রাখো রাজর্ষি, ব্রহ্মশক্তির অহঙ্কারে যাকে তুমি আজ পথের ভিক্ষুক করেছো, একদিন অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। এ যদি মিথ্যা হয়—তাহলে ধর্ম মিথ্যা—ভগবান মিথ্যা—চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা—সব—সব মিথ্যা হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। তবু ডুব যখন দিয়েছি—তখন দেখবো এর শেষ কোথায়?

দেবানিক। হ্যাঁ—ঐ শেষ দেখতে দেখতে যখন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া

সাপ হয়ে যাবেন তখন বুঝবেন—পাপ কোনদিন বাপকেও ক্ষমা করে না।

বিশ্বামিত্র। দেবানিক—

দেবানিক। পায়ের ধূলো দিন গুরুদেব, আমি চললাম, আর আপনার শিষ্যত্ব করবো না।

বিশ্বামিত্র। শিষ্যত্ব করবি না মানে—!

দেবানিক। মানে—আমি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য থাকতে পারি কিন্তু রাজা বিশ্বামিত্রের শিষ্যত্ব করবো না।

বিশ্বামিত্র। কি বললি—?

দেবানিক। আবার যদি কোনদিন আগের মত আশ্রমবাসী হন, জগতের মঙ্গল কামনায় সাধন ভজন করেন—সেদিন না ডাকলেও আমি এসে আপনার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বো। কিন্তু এখনকার মত গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ শেষ।

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। হুঁ—বিশ্বামিত্র আজ সকলের কাছে ব্যঙ্গের পাত্র হয়েছে। সকলেই পঞ্চমুখে তার নিন্দে করছে। করুক নিন্দে, এই নিন্দেকেই আমি অঙ্গের ভূষণ করবো। বিক্রমজিৎ—

বিক্রমজিৎ। বলুন রাজর্ষি—

বিশ্বামিত্র। সিংহাসনে বসতে পারবে?

বিক্রমজিৎ। আমি—!

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ, আজই আমি বারাণসী যাবো। যতদিন ফিরে না আসি ততদিন আমার হয়ে রাজ্য শাসন করতে পারবে?

বিক্রমজিৎ। আপনার আশীর্বাদ থাকলে কেন পারবো না প্রভু! আমিওতো ক্ষত্রিয় সন্তান।

বিশ্বামিত্র। মনে রাখতে হবে—রাজ্য আমার। আমি যখনই এসে চাইবো আবার ফিরিয়ে দিতে হবে।

বিক্রমজিৎ। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, আপনার রাজ্য আপনাকে ফিরিয়ে দেবো না কেন!

বিশ্বামিত্র। তবে বস এই সিংহাসনে, ধর রাজদণ্ড—রাজমুকুট—আজ থেকে তুমি অযোধ্যার রাজা—বিশ্বামিত্রের প্রতিভূ। কিন্তু সাবধান, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের এই পুণ্যময় পবিত্র সিংহাসনের যদি বিন্দুমাত্র অমর্যাদা হয় তাহলে বিশ্বামিত্রের রোষ দৃষ্টি থেকে তুমিও বাদ যাবে না।

বিক্রমজিৎ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন প্রভু, আমি প্রাণ দিয়েও সিংহাসনের মর্যাদা রক্ষা করবো।

বিশ্বামিত্র। দর্পি রাজা হরিশ্চন্দ্র, দর্পভরে রাজ্য দান করে দিয়ে মনে করেছো তুমি জয়ী হয়েছো—আর বিশ্বামিত্র তোমার কাছে হেরে গেছে! না-না—তা হবে না, আমিও দেখবো—কতদিন তোমার এই দর্প থাকে, কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাও কিনা!

[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমি জয়ী—আমি জয়ী। ধার্মিক হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী পুত্র নিয়ে আজ পথের ভিখারী হয়েছে। রাজর্ষি ক্রোধ রিপুর তাড়নায় ধর্ম-কর্ম ভুলে অধর্মের পথে ছুটে চলেছে। কোথায় ধর্ম—কোথায় তোমার অস্তিত্ব! দেখে যাও—অযোধ্যার ধর্ম-সিংহাসনে কে আজ রাজা হয়ে বসেছে!

মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। বন্ধু—বন্ধু—

বিক্রমজিৎ। এসো—এসো বন্ধু, শুনলে সুখী হবে—আজ আমি অযোধ্যার রাজা।

মহেন্দ্র। তুমি রাজা! কেন—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র!

বিক্রমজিৎ। তিনিই আমাকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন।

মহেন্দ্র। বাঃ—চমৎকার! তুমিতো রাজা হয়ে বসলে বন্ধু—কিন্তু আমি?

বিক্রমজিৎ। তোমাকেও আমি বঞ্চিত করবো না, আমরা এক সঙ্গেই রাজত্ব ভোগ করবো। তোমাকে আমি প্রধান সেনাপতি করে দেবো।

মহেন্দ্র। কি বললে—প্রধান সেনাপতি করে দেবে!

বিক্রমজিৎ। কেন দেবো না—তুমি যে আমার অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু!

মহেন্দ্র। আমি প্রধান সেনাপতি হব! সামান্য রাজকর্মচারী থেকে প্রধান সেনাপতি! তুমি সত্যি বলছো তো?

বিক্রমজিৎ। সত্যি। কিন্তু তার আগে তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে।

মহেন্দ্র। নিশ্চয়ই করবো। বল কি করতে হবে?

বিক্রমজিৎ। প্রথম কাজ—আমাদের পিছনে দুটো শত্রু আছে। তারা ধর্মের বুলি ছাড়া কথা বলে না। তাদের বন্দী করতে হবে।

মহেন্দ্র। তারা কারা?

বিক্রমজিৎ। একজন মন্ত্রী রাঘব রায়, আর একজন তোমার বাবা।

মহেন্দ্র। সেকি—আমি আমার বাবাকে বন্দী করবো!

বিক্রমজিৎ। কেন করবে না! ঐ বাবাই না একদিন তোমার বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রের কাছে অভিযোগ করেছিল?

মহেন্দ্র। কিন্তু তবু ছেলে হয়ে আমি—

বিক্রমজিৎ। মনে রেখো বন্ধু, প্রধান সেনাপতির পদ—সেই সঙ্গে বহু অর্থ।

মহেন্দ্র। পারবো বন্ধু—নিশ্চয়ই পারবো। তুমি যা বলবে—আমি তাই করবো।

বিক্রমজিৎ। সাবাস—এই তো চাই—

মহেন্দ্র। বল—আর কি করতে হবে ?

বিক্রমজিৎ। রাজ্যে যেখানে যত মন্দির, ধর্মশালা, আশ্রয় আছে—সব ধ্বংস করে সেখানে প্রমোদোত্থান তৈরী করতে হবে।

মহেন্দ্র। বন্ধু—

বিক্রমজিৎ। যেখানে যত ধার্মিক আছে—সবাইকে বন্দী করে কারাগারে রাখতে হবে ; তবেই আমাদের রাজত্ব নিষ্কণ্টক হবে—তবেই আমরা হাসিমুখে রাজত্ব করতে পারবো—

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র। আশ্চর্য ! রাজা হয়ে বন্ধু কি পাগল হয়ে গেল নাকি ! কিন্তু আমি এখন কি করবো—এগিয়ে যাবো না পিছিয়ে আসবো ! না-না, পিছিয়ে গেলে চলবে না। বন্ধুর আদেশ আমাকে মানতেই হবে। সেনাপতি আমাকে হতেই হবে—

[প্রস্থান।

———

একাদশ দৃশ্য।

বারাণসীর রাজপথ।

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। ওঃ—এত বেলা হল, এখনও তো উনি ফিরে এলেন না! ছেলেটা কাল থেকে না খেয়ে আছে; ক্ষিধেতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো পথের উপরে ঘুমিয়েই পড়েছে। একি—রোহিত গেল কোথায়! রোহিত—রোহিত—

রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। কি হয়েছে মা?

শৈব্যা। কোথায় গিয়েছিলি মাণিক? জানিস না তোকে এক মুহূর্ত না দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই?

রোহিতাশ্ব। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছিল কি না—তাই ঐ পুকুর থেকে পেট ভরে জল খেয়ে এলাম।

শৈব্যা। [বুকে জড়িয়ে ধরে] ওঃ ভগবান, এ তোমার কি অভিনব পরীক্ষা! সসাগরা ধরণীর মালিক আজ ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! একমাত্র ছেলে—রাজভোগে যার তৃপ্তি হত না—সে জল খেয়ে পেট ভরাচ্ছে! এ দৃশ্য আমি সইতে পাচ্ছি না—রোহিত—রোহিত, মাণিক আমার—

রোহিতাশ্ব। কেঁদনা মা—কেঁদনা, তোমার কান্না দেখলে আমারও যে ভীষণ কান্না পায়!

শৈব্যা। তবুও যে আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না বাবা, বুকের

ব্যথা জোর করে চোখের জল টেনে আনছে! ওঃ—মায়ের সামনে ছেলে যদি করুণ মুখে এসে দাঁড়ায়—

রোহিতাশ্ব। মা!

শৈব্যা। তোমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে—না মাণিক?

রোহিতাশ্ব। হ্যাঁ মা খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তোমাদেরও তো আমার মত ক্ষিধে পেয়েছে, তুমি আর বাবাও তো কাল থেকে না খেয়ে আছো।

শৈব্যা। আমরা তবু বড়—ক্ষিধে সইতে পারি, কিন্তু তুই যে একেবারে ছেলেমানুষ।

রোহিতাশ্ব। আচ্ছা মা, সত্যসন্ধ দাদা যে বলতো—ধর্ম আছে, ভগবান করুণাময়, তাঁর নাম করলে সব দুঃখ দূর হয়ে যায়—সে কি সব মিথ্যে?

শৈব্যা। ছিঃ-ছিঃ বাবা, ওকথা বলতে নেই—মহাপাপ হবে! ধর্ম আছে, ভগবান করুণাময়।

রোহিতাশ্ব। তাই যদি হবে—তাহলে কেন আমাদের এত দুঃখ, কেন আমরা এত কষ্ট পাচ্ছি?

শৈব্যা। দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েই যে তিনি মানুষকে যাচাই করেন বাবা। দেখছো না তোমার বাবা সসাগরা ধরণীর মালিক হয়েও ধর্ম রক্ষার জন্যে কত কষ্ট বরণ করে নিয়েছেন! কত অপমান—কত লাঞ্ছনা সইছেন—তবু ধর্মকে ত্যাগ করেননি, ভগবানের নামও ভোলেননি।

রোহিতাশ্ব। বাবা এখনও ফিরছেন না কেন মা?

শৈব্যা। কি জানি—এত দেরী হচ্ছে কেন! প্রতিদিন আমাদের এই গাছতলায় বসিয়ে রেখে ভিক্ষে করতে যান, কিন্তু কোনদিন তো ফিরতে এত দেরী করেন না!

রোহিতাশ্ব। তবে আজ এত দেরী হচ্ছে কেন ? আমি যে আর ক্ষিধেতে দাঁড়াতে পারছি না !

শৈব্যা। ভগবান, আমাকে শক্তি দাও—শক্তি দাও।

রোহিতাশ্ব। মা—

শৈব্যা। আয় বাবা—আয়, আমার কোলে মাথা রেখে একটু শুয়ে থাক—দেখবি এখুনি তোর বাবা এসে যাবে। [শৈব্যার কোলে মাথা রেখে রোহিত শুয়ে পড়ে] রোহিত, আমি তোর অভাগিনী মা, তাই কাল থেকে তোর মুখে একমুঠো অন্ন দিতে পারিনি। তুই কতবার করুণ চোখে আমার দিকে চেয়েছিস—আমি সব বুঝেও কোন প্রতিকার করতে পারিনি, শুধু পাষাণে বুক বেঁধে সহ্য করেছি। রোহিত—রোহিত—আহা বাছা আমার, ক্ষিধেতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভগবান, আমাদের তো সব গেছে—শুধু এই একটা সম্পদ বুক দিয়ে আগলে রেখেছি, একে যেন তুমি কেড়ে নিওনা ঠাকুর—একে যেন তুমি কেড়ে নিওনা ! একি—আমার চোখ দুটো এমন ঘুমে জড়িয়ে আসছে কেন ! একি ঘুম—একি ঘুম এলো ! আর যে বসে থাকতে পারছি না ! [রোহিতের গায়ে মাথা দিয়ে ঢলে পড়ে]

পরমান্নের থালা হাতে ধর্মের রূপে সত্যসন্ধের প্রবেশ।

ধর্ম। মা শৈব্যা, কুমার রোহিতাশ্ব, আমি এসেছি। এই নাও—স্বর্গ থেকে তোমাদের জন্য পরমান্ন এনেছি। এই পরমান্ন খেলে আর কোন দিনও তোমাদের ক্ষিধের জ্বালা সইতে হবে না। [এক ধারে থালা রাখে]

শৈব্যা। [নিদ্রার ঘোরে] কে তুমি—কে তুমি দয়াল দেবতা !

ধর্ম। যাকে ভালবেসে তোমরা সব কিছু ত্যাগ করেছো—আমি

সেই। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো। আমার উপর বিশ্বাস রেখো, দেখবে—এই দুঃখের রাতের একদিন অবসান হবেই। আবার তোমার সংসার হাসি আর আলোয় ভরে উঠবে—যথা ধর্ম তথা জয়—

[প্রস্থান।

শৈব্যা। [তন্দ্রার ঘোরে] যথা ধর্ম তথা জয়! যেওনা—যেওনা জ্যোতির্ময়—যেওনা। [তন্দ্রা ভেঙে যায়]. একি—আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম! স্বপ্ন—কিন্তু মনে হল যেন স্পষ্ট তার কথা শুনলাম—স্পষ্ট ভাত দেখতে পেলাম—অথচ—রোহিত—রোহিত—

রোহিতাশ্ব। [নিদ্রা ভেঙ্গে] মা—মা, সত্যসন্ধ দাদা এসেছে—সত্যসন্ধ দাদা এসেছে।

শৈব্যা। সত্যসন্ধ!

রোহিতাশ্ব। হ্যাঁ মা, আমি ঘুমের ঘোরে দেখতে পেলাম—সত্যসন্ধ দাদা এসেছে। আমাকে বলছে—রোহিত, আমি এসেছি। স্বর্গ থেকে তোমার জন্যে পরমান্ন এনেছি। এ পরমান্ন খেলে আর কোনদিন ক্ষিধে পায় না।

শৈব্যা। আমিও দেখেছি বাবা, আমিও শুনেছি সেই কথা। তুই দেখেছিস—সত্যসন্ধ, আর আমি দেখেছি—সে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ।

রোহিতাশ্ব। একি মা, এখানে খাবার কোত্থেকে এলো!

শৈব্যা। খাবার! ওরে রোহিত, আমাদের স্বপ্ন মিথ্যে নয়। সত্যই দেবতা এসেছিলো, আমাদের স্বপ্নের ঘোরে দেখা দিয়ে গেল। একটু আগে তুই তাঁর করুণায় সন্দেহ করেছিলি না! দেখ—দেখ ধর্ম আছে—ঈশ্বর মঙ্গলময়।

হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। আবার বল—আবার বল—জীবনে মরণে ঐ একটা কথাই মনে রেখো শৈব্যা—ধর্ম আছে—ঈশ্বর মঙ্গলময়।

রোহিতাশ্ব। বাবা—তুমি এসে গেছো!

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ এসে গেছি। কিন্তু—

শৈব্যা। হ্যাঁগা—তোমার ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন?

হরিশ্চন্দ্র। দেরী হবে না! সারাদিন ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বারাণসীর পথে পথে ঘুরেছি, কত মানুষকে অনুরোধ করেছি—কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পায়ে ধরেছি, কিন্তু—

শৈব্যা। ওঃ ভগবান, এও আমাকে শুনতে হ'ল! একদিন যার অন্নে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিপালিত হয়েছে—তাকেই আজ একমুঠো অন্নের জন্যে মানুষের পায়ে ধরতে হচ্ছে!

হরিশ্চন্দ্র। তাতেও আমার দুঃখ ছিল না শৈব্যা, যদি রোহিতের জন্য একমুঠো অন্নের জোগাড় করতে পারতাম।

রোহিতাশ্ব। বাবা—

হরিশ্চন্দ্র। আমার নিরুপায় অবস্থা বুঝে আজও তোমাকে উপোষ করে থাকতে হবে বাবা।

রোহিতাশ্ব। না-না আর আমাদের উপোষ করে থাকতে হবে না বাবা, আর আমাদের জন্যে তোমাকে মানুষের পায়ে ধরতে হবে না। এই দেখ সত্যসন্ধ দাদা স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমাদের পরমান্ন দিয়ে গেছে।

হরিশ্চন্দ্র। সত্যসন্ধ পরমান্ন দিয়ে গেছে—রোহিত কি বলছে শৈব্যা!

শৈব্যা। হ্যাঁ প্রভু, রোহিত তাঁকে সত্যসন্ধ রূপে দেখেছে, আর আমি তাঁকে দেখেছি—সে এক আলোর দেবতা। স্বপ্নে আমাদের দেখা দিয়ে

পরমান্ন দান করে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওঃ—কি তাঁর রূপ—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হরিশ্চন্দ্র। দেবতা এসেছিলো শৈব্যা—দেবতা এসেছিলো! কে বলে আমি সব হারিয়েছি—কে বলে আমি পথের কাঙ্গাল! দেবতার আশীর্বাদ যার মাথায় এমনি ভাবে ঝরে পড়ছে—তার চেয়ে ভাগ্যবান এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই—কেউ নেই।

রোহিতাশ্ব। মা—

শৈব্যা। আয় বাবা—আয়, তোর মুখখানা বড় শুকিয়ে গেছে। কাল থেকে না খেয়ে আছিস। আয়—দেবতার দেওয়া পরমান্ন পেট ভরে খেয়ে নে।

রোহিতাশ্ব। তোমরাও না খেয়ে আছো মা, এসো—আমরা এক সঙ্গে খাই।

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ-হ্যাঁ সেই ভালো শৈব্যা—সেই ভালো—আমরা এক সঙ্গেই খাই। সত্যি কথা বলতে কি—আমারও বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

তিনজনে বসে একসঙ্গে অন্ন মুখে দিতে যায় এমন সময় ভিখারীর ছদ্মবেশে অধর্মের প্রবেশ।

অধর্ম। আঃ—আঃ—

[তিনজনে আহার বন্ধ রাখে]

সকলে। কে—কে তুমি?

অধর্ম। আমি ভিখারী ব্রাহ্মণ বাবা, আজ পাঁচ দিন খাইনি। ক্ষিধেতে আমার সর্ব শরীর কাঁপছে—আমাকে কিছু খেতে দেবে!

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা—[থালা তুলে নিয়ে দাঁড়ায়]

শৈব্যা। ওগো—রোহিত যে কাল থেকে না খেয়ে আছে!

অধর্ম। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি বাবা।

হরিশ্চন্দ্র। স্থির হও ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে—

অধর্ম। খেতে দেবে!

রোহিতাশ্ব। বাবা—বাবা—আমি যে—

হরিশ্চন্দ্র। ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ—তুমি কাল থেকে না খেয়ে আছো— [রোহিতের দিকে তাকায়]

অধর্ম। আঃ—আর দাঁড়াতে পারছি না, বড় ক্ষিধে—বড় ক্ষিধে—

হরিশ্চন্দ্র। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—[স্বগতঃ] তাইতো—কি করি—কি করি? রোহিত কাল থেকে না খেয়ে আছে, আর এই ব্রাহ্মণ পাঁচ দিন খায়নি। রোহিত আমার ছেলে, আর এই ব্রাহ্মণ আমার কাছে প্রার্থী। একদিকে পুত্র—আর একদিকে ধর্ম। কে বড়? পুত্র না ধর্ম—ধর্ম না পুত্র?

অধর্ম। কিগো—খেতে দেবে না? বুঝলাম—অনাহারে মরণই বোধ হয় আমার বিধিলিপি।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগতঃ] ধর্ম বড়—আমার কাছে ধর্মই বড়। [প্রকাশ্যে] এই নাও ব্রাহ্মণ, এই নাও খাদ্য। [খাদ্যের থালা দেয়]

অধর্ম। মঙ্গল হোক বাবা—তোমার মঙ্গল হোক। [স্বগতঃ] দেখবো —ধর্ম, কি করে তুমি এদের রক্ষা কর—

[থালা নিয়া প্রস্থান।

রোহিতাশ্ব। মা—মা—

শৈব্যা। রোহিত, বাবা আমার—মাণিক আমার—

হরিশ্চন্দ্র। কাঁদিসনি রোহিত, কেঁদনা শৈব্যা, মনে কর এও সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা। দেবতার দেওয়া অন্ন দেবতার ভোগেই লেগেছে।

রোহিতাশ্ব। বাবা—

হরিশ্চন্দ্র। তুমি পুণ্যবান, নিজের মুখের গ্রাস মৃত্যু পথযাত্রী ব্রাহ্মণকে দিয়েছো। এতে যদি তোমার মৃত্যুও হয়—পরলোকে দেব সমাজে তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ আসন পাতা থাকবে রোহিত।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। হরিশ্চন্দ্র—

হরিশ্চন্দ্র। রাজর্ষি! শৈব্যা—রোহিত, প্রণাম কর—

[তিনজনে প্রণাম করে]

বিশ্বামিত্র। মঙ্গল হোক। হরিশ্চন্দ্র, দক্ষিণার কথা মনে আছে? আজ এক মাস পূর্ণ হ'ল।

হরিশ্চন্দ্র। সত্যিই দেখতে দেখতে আজ এক মাস পূর্ণ হয়ে গেল।

বিশ্বামিত্র। এইবার তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর।

হরিশ্চন্দ্র। রাজর্ষি, আমি—

বিশ্বামিত্র। কি হ'ল—চুপ করে আছো কেন, দক্ষিণা দাও!

হরিশ্চন্দ্র। দুঃখের কথা কি বলবো রাজর্ষি, এই এক মাস আমি দক্ষিণার অর্থ সংগ্রহের জন্য স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে ঝড়-জল মাথায় করে পথে পথে ঘুরেছি। ভিক্ষে করে দিন কাটাচ্ছি। অনাহারে অনিদ্রায় ধীরে ধীরে মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু—

বিশ্বামিত্র। এসব কথা আমি শুনতে আসিনি হরিশ্চন্দ্র। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—একমাস পরে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দানের দক্ষিণা দেবে, আমি সেই দক্ষিণা নিতে এসেছি।

হরিশ্চন্দ্র। জানি—কিন্তু আমি যে এখনও এক কপর্দকও সংগ্রহ করতে পারিনি ঋষি!

বিশ্বামিত্র। কি. ব্রাহ্মণের সংগে ছলনা!

শৈব্যা। বিশ্বাস করুন রাজর্ষি, কাল থেকে আমার এই দুধের ছেলেটাও উপোষ করে আছে। পয়সার অভাবে একমুঠো অন্নও আমরা ওর মুখে তুলে দিতে পারিনি।

রোহিতাশ্ব। মা—মা, ঐ দেখ কতগুলো মানুষ ওখানে ভীড় করে আছে। আমি যাই—দেখি ওদের কাছে যদি কিছু ভিক্ষে পাওয়া যায়। ওগো—আমাকে কিছু ভিক্ষে দেবে—কিছু খেতে দেবে—

[প্রস্থান।

শৈব্যা। রোহিত—রোহিত—

হরিশ্চন্দ্র। যেতে দাও শৈব্যা, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

বিশ্বামিত্র। হরিশ্চন্দ্র।

হরিশ্চন্দ্র। দেখ—দেখ রাজর্ষি, নিজের চোখেই দেখ; এর পরেও কি বলবে—আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করছি!

বিশ্বামিত্র। বেশ, দক্ষিণা যখন দিতেই পারবে না—তখন তোমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাও।

হরিশ্চন্দ্র। ক্ষমা—!

বিশ্বামিত্র। তোমার রাজ্য তুমি ফিরিয়ে নাও।

হরিশ্চন্দ্র। না ঋষি, আমি মহারাজ হরিবিজের পুত্র—সূর্য বংশধর। দারিদ্রের নিষ্পেষনে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মরবো, স্ত্রী-পুত্রকে হাসতে হাসতে চিতায় তুলে দেবো—তবু একবার যা দান করেছি—প্রাণান্তেও আর তা ফিরিয়ে নেবো না।

বিশ্বামিত্র। বাঃ—চমৎকার—চমৎকার! দানও ফিরিয়ে নেবে না—আর দক্ষিণাও দিতে পারবে না। তাহলে এ দানের মূল্য কি? আমিই বা এই অসিদ্ধ দান নেবো কেন?

হরিশ্চন্দ্র। রাজর্ষি—

বিশ্বামিত্র। এখনও ভাল কথা শোন হরিশ্চন্দ্র, সামনে তোমার দুটো পথ—হয় ক্ষমা প্রার্থনা করে রাজ্য ফিরিয়ে নাও, আমি তোমাকে সব দায় থেকে মুক্তি দেবো। আর না হয় পৃথিবীতে যদি তোমার দানের মহিমা প্রচার করতে চাও—তাহলে আমাকে দক্ষিণা দিয়ে ঋণ মুক্ত কর।

হরিশ্চন্দ্র। দেবো—দেবো—নিশ্চয়ই আমি দক্ষিণা দেবো। তুমি সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি তোমার শরণাপন্ন—তুমিই আমাকে বুদ্ধি দাও ঋষি, কেমন করে আমি ঋণ মুক্ত হই !

বিশ্বামিত্র। আরও চমৎকার। আমি তোমাকে বুদ্ধি দেব আর তুমি আমার ঋণ শোধ করবে ! ধিক—শতধিক তোমাকে !

শৈব্যা। রাজর্ষি, আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি—আমার স্বামীকে আর কিছুদিন সময় দিন ! নিশ্চয়ই উনি আপনার ঋণ শোধ করে দেবেন।

বিশ্বামিত্র। না-না—একমাসের মধ্যে যে এক কপর্দকও সংগ্রহ করতে পারেনি—সেই শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদীকে আর আমি সময় দিতে পারবো না।

শৈব্যা। কি বললেন—কি বললেন আপনি, আমার স্বামী শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ! এক কথায় যিনি যথা সর্বস্ব দান করে আজ পথের ভিখারী হয়েছেন—তাঁকে এতবড় কথা বলতে আপনার বিবেকে একটুও বাধলো না ! আপনি ঋষি—না—

বিশ্বামিত্র। না—না—

হরিশ্চন্দ্র। ছিঃ-ছিঃ শৈব্যা, তোমার এত উত্তেজিত হওয়া শোভা পায় না।

শৈব্যা। স্বামী—

হরিশ্চন্দ্র। ব্রাহ্মণের অপমান করতে নেই, ব্রাহ্মণ যে দেবতা !

শৈব্যা। আর তুমি যে আমার দেবতা। আমার সামনে তোমার এই অপমান কি করে সহ্য করবো!

হরিশ্চন্দ্র। করতেই হবে, আমি যে অপরাধী—আমি যে ঋণী!

বিশ্বামিত্র। এখনও বল হরিশ্চন্দ্র, কি করবে তুমি?

হরিশ্চন্দ্র। ওগো বিশ্বনাথ, সব হারিয়ে আমি তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছি; তুমিই আমাকে বলে দাও—এখন আমি কি করি—কোন পথে যাই!

দ্রুত রোহিতাশ্বের পুনঃ প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। মা—মা, আমি ভিক্ষে করতে গিয়ে দেখলাম—ওখানে মানুষ বিক্রি হচ্ছে।

হরিশ্চন্দ্র। পেয়েছি—পেয়েছি—পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।

বিশ্বামিত্র। হরিশ্চন্দ্র—

হরিশ্চন্দ্র। আর একটু অপেক্ষা কর রাজর্ষি, আর একটু অপেক্ষা কর। আজই আমি তোমার ঋণ শোধ করে দেবো।

বিশ্বামিত্র। বেশ। আমি বিশ্বনাথকে প্রণাম করে ফিরে আসছি, তুমি অর্থ সংগ্রহ কর। কিন্তু মনে থাকে যেন—সূর্যাস্তের আগেই যদি ঋণ শোধ করতে না পার তাহলে তোমার দানের কোন মহত্ত্ব থাকবে না—

[প্রস্থান।

শৈব্যা। স্বামী—

হরিশ্চন্দ্র। বল শৈব্যা, বল রোহিত, জয় বাবা বিশ্বনাথ—জয় মাতা অন্নপূর্ণা—। কে আছো দেবতা, কে আছো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, শূদ্র বৈশ্য অথবা চণ্ডাল—যদি কারও ক্রীতদাসের প্রয়োজন থাকে এইখানে এসো—

আমি ক্রীতদাস হব—আমাকে ক্রয় করে নিয়ে যাও। কে আছো—কার ক্রীতদাস চাই ?

টাকার থলি হাতে তীর্থনাথের প্রবেশ।

তীর্থ। কে—কে বিক্রী হবে ?

হরিশ্চন্দ্র। আমি—ব্রাহ্মণ—আমি—

তীর্থ। তুমি ! কিন্তু আমারতো দাসের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন দাসীর।

হরিশ্চন্দ্র। না-না, দাসী এখানে নেই।

তীর্থ। নেই ! তবে যাই—দেখি অন্য কোথাও পাই নাকি—।

শৈব্যা। দাঁড়ান ব্রাহ্মণ, দাসী আছে।

তীর্থ। আছে ?

শৈব্যা। আমিই সেবাপণে বিক্রী হব।

রোহিতাশ্ব। মা— !

হরিশ্চন্দ্র। কি বলছো শৈব্যা ! তুমি—

শৈব্যা। তোমারই অর্দ্ধাঙ্গিনী, তোমার সুখ-দুঃখের সমঅংশ-ভাগিনী। তাইতো নিজেকে বিক্রী করে রাজর্ষির ঋণ থেকে তোমাকে মুক্ত করতে চাই।

হরিশ্চন্দ্র। না-না শৈব্যা—তা হয় না।

শৈব্যা। কেন হয় না ? আমিতো কোনদিন তোমার ধর্মে বাধা দিইনি। তবে তুমি কেন আজ আমার ধর্মে বাধা দেবে ?

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা—

শৈব্যা। না-না আপত্তি করনা। আমাকে আমার ধর্ম পালন করতে দাও। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, আপনি আমাকে ক্রয় করে নিয়ে চলুন।

তীর্থ। নিয়েতো যাবো—কিন্তু তোমাকে দেখে যে খুব বড় ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে মা! তুমি কি দাসীর কাজ করতে পারবে?

শৈব্যা। পারবো—পারবো, স্বামীর মুক্তির জন্য দাসীর কাজতো তুচ্ছ—আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি। দিন ব্রাহ্মণ—অর্থ দিন—আমাকে ক্রয় করুন!

তীর্থ। বুঝলাম—অর্থের জন্যে তোমরা খুব বিপদে পড়েছ, তা কত দিতে হবে মা?

শৈব্যা। সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা।

তীর্থ। সহস্র! অত অর্থতো আমার কাছে নেই! আমি পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পারি।

শৈব্যা। তাই দিন—তাই দিন, তাতেও অর্দ্ধেক ঋণতো শোধ হবে!

তীর্থ। এই নাও মা—

হরিশ্চন্দ্র। আমাকে দাও ব্রাহ্মণ—আমাকে দাও [থলি নেয়]। দেখো—দেখো জগৎবাসী, স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখো তেত্রিশ কোটি দেবতা—অগ্নি নারায়ণ সাক্ষী রেখে যাকে একদিন বিবাহ করে এনেছিলাম—যার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলাম—আজ সেই ধর্মপত্নীকে আমি বিক্রয় করছি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—[কাঁদিয়া ফেলে]

শৈব্যা। তুমি দুঃখ কর না, আমি যে স্বামীর মঙ্গলের জন্যে দাসী-পণে বিক্রীত হয়েছি—এমন ভাগ্য কার হয়! আমার চেয়ে ভাগ্যবতী এ সংসারে আর কে আছে!

তীর্থ। একটু তাড়াতাড়ি এসো মা, আমার স্ত্রী আবার একটু মুখরা। বেশী দেরী হলে আবার—

শৈব্যা। না-না—এই যাই—

রোহিতাশ্ব। মা—মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো মা।

শৈব্যা। বাবা, আমার এই একমাত্র ছেলে—কখনো মা ছাড়া থাকেনি, এ যদি আমার সঙ্গে যায়—

তীর্থ। আমার কোন আপত্তি নেই মা, কিন্তু আমার ব্রাহ্মণী যদি ওকে—

শৈব্যা। কোন চিন্তা করবেন না বাবা, ও আপনার ফুল তুলে দেবে, পূজোর যোগাড় করে দেবে—তার জন্যে ওকে আলাদা কোন খাবার দিতে হবে না, আমাকে যা খেতে দেবেন—তাই আমরা ভাগ করে খাবো।

তীর্থ। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—একি বলছো মা! আমি ওকথা ভাবছি না—আমি ভাবছি—যাক সেকথা—নিয়ে চল মা—নিয়ে চল তোমার ছেলেকে, আমিই ব্রাহ্মণীকে সব কথা গুছিয়ে বলবো।

শৈব্যা। আসি—স্বামী—!

হরিশ্চন্দ্র। এ্যাঁ—যাবে! হ্যাঁ-হ্যাঁ—যাবেইতো—যাবেইতো, আরতো তোমাকে ধরে রাখার কোন অধিকার নেই! তুমি যে আমাকে ঋণ মুক্ত করতে সেবাপণে বিক্রীত হয়েছ!

রোহিতাশ্ব। বাবা—

হরিশ্চন্দ্র। আমাকে কাঙ্গাল সাজিয়ে তুমিও চলে যাচ্ছো মাণিক! যাও—যাও, আমি তোমার অক্ষম বাবা, তোমাকে সময়মত খেতে দিতে পারি না—মায়ের সঙ্গে গেলে তবু দুটো খেতে পাবে।

রোহিতাশ্ব। বাবা—বাবা—[জড়িয়ে ধরে]

হরিশ্চন্দ্র। যাও বাবা, জীবনে কোনদিন মায়ের অবাধ্য হওনা, হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ধর্মকে কোনদিন ত্যাগ করনা। রোহিত—রোহিত আমার—

তীর্থ। ওঃ, স্বামী—স্ত্রী—পিতা—পুত্রের এই বিচ্ছেদের দৃশ্য চোখে

দেখা যায় না! মা, তোমরা এসো, আমি ঐ গাছতলায় তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি—

[প্রস্থান।

শৈব্যা। বাবাকে প্রণাম কর রোহিত!

রোহিতাশ্ব। [হরিশ্চন্দ্রকে প্রণাম করে] আসি বাবা—

গীত।

প্রণাম নাও গো চরণে।
আর যদি কভু দেখা নাহি হয়
[শুধু] মুখখানি রেখো স্মরণে।
দুঃখ যদি আরও আসে ওগো—
সাদরে করিব বরণ—যে গো—
হাসি মুখে সব সহিব গো আমি—
বরণ করিয়া মরণে।

[গীতান্তে শৈব্যা ও রোহিতের প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা—রোহিত, রোহিত—শৈব্যা, নিভে গেলো—নিভে গেলো—আলো নিভে গেলো! দুঃখের সাথী শৈব্যা, শোকের সান্ত্বনা রোহিত—তারাও আজ হারিয়ে গেল! আঃ—বিচ্ছেদের একি জ্বালা! ভগবান, শক্তি দাও—শক্তি দাও ভগবান—দুঃখ জয়ে শক্তি দাও।

বিশ্বামিত্রের পুনঃ প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। দক্ষিণা দাও!

হরিশ্চন্দ্র। এসেছো—এসেছো রাজর্ষি, এসো—এসো, আজ আমি মহা ভাগ্যবান! আমাকে ঋণ মুক্ত করতে মহারাণী শৈব্যা আজ দাসী-পণে বিক্রীত হয়েছে।

বিশ্বামিত্র । কি বললে ! মহারাণী শৈব্যা—

হরিশ্চন্দ্র । নাও—নাও রাজর্ষি, দক্ষিণা নাও—দক্ষিণা নাও— [টাকার থলি দেয়]

বিশ্বামিত্র । একি, এ স্বর্ণমুদ্রা—না সতীর চোখের জল ! একি দক্ষিণা না মর্ম ছেঁড়া অভিশাপ ! শাস্ত্রকার—কোথায় তুমি ? নেমে এসে জবাব দাও—কেন লিখেছিলে নারী নরকের দ্বার ? আবার নূতন করে লেখো—নারীই স্বর্গের সোপান ।

হরিশ্চন্দ্র । রাজর্ষি—

বিশ্বামিত্র । কে ! ও—হরিশ্চন্দ্র, বল কত অর্থ আছে এতে ?

হরিশ্চন্দ্র । পাঁচশত ।

বিশ্বামিত্র । বাকী অর্থ ?

হরিশ্চন্দ্র । এখনও বাকী আছি আমি । এখনও সূর্য অস্ত যায়নি । কে আছো ক্রেতা—কে আছো বান্ধব, যদি কারও দাসের প্রয়োজন থাকে এখানে এসো, আমি বিক্রী হব—আমাকে ক্রয় কর ।

মহেশ চাঁড়ালের প্রবেশ, বিশ্বামিত্র একদিকে সরে দাঁড়ায় ।

মহেশ । কেরে—কে এত হাঁকাহাঁকি করছে—কে বিক্রী হবে ?

হরিশ্চন্দ্র । আমি—আমি বিক্রী হব । বল—বল তোমার কি দাসের প্রয়োজন আছে ?

মহেশ । আছে তো বটে, কিন্তু—

হরিশ্চন্দ্র । কিন্তু কি ?

মহেশ । তোকে দেখেতো ভদ্দরলোক বলে মনে হচ্ছে, তুই কি আমার কাজ করতে পারবি ?

হরিশ্চন্দ্র। পারবো—পারবো, আজ পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যা আমি করতে পারবো না। বল—কি তোমার কাজ ?

মহেশ। শ্মশানে মড়া জ্বালাতে হবে, আমি যে চণ্ডাল।

হরিশ্চন্দ্র। চণ্ডাল হলেও তুমি মানুষ।

মহেশ। আমার গাঁজা বানিয়ে দিতে হবে, ভাঙ্গ বেটে দিতে হবে।

হরিশ্চন্দ্র। তুমি যা বলবে—আমি তাই করবো।

বিশ্বামিত্র। আমি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো, ঐ দেখ—সূর্য্য অস্তাচলগামী।

হরিশ্চন্দ্র। ওগো সূর্যদেব, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর! আমি যে তোমারই বংশধর! আমাকে ঋণ মুক্ত হওয়ার সুযোগ দাও।

মহেশ। তুই আবার কেরে ?

হরিশ্চন্দ্র। মহাতপা বিশ্বামিত্র, ব্রাহ্মণ। আমার মাথার মণি। আমি ওঁর কাছে ঋণী। তাই স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রী করে অর্দ্ধেক শোধ করেছি; বাকী অর্দ্ধেক নিজেকে বিক্রী করে শোধ করবো।

মহেশ। বুঝলাম—তুই খুব ধার্মিক লোক। কিন্তু এই ঠাকুরবাবা, তুই তো সংসার টংসার করিস না—সাধন-ভজন নিয়েই থাকিস, তুই টাকা নিয়ে কি করবি ?

বিশ্বামিত্র। সে প্রশ্নের জবাব একটা চণ্ডালের কাছে দেবনা।

মহেশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ আমিতো চণ্ডাল—কিন্তু তুই কি? ঋষি হয়েও টাকার উপর যার এত লোভ—সেতো চণ্ডালেরও অধম।

বিশ্বামিত্র। চণ্ডাল—

হরিশ্চন্দ্র। ছিঃ-ছিঃ সর্দার, ওকথা বলতে নেই। তুমি আমাকে অর্থ দাও, আমাকে ক্রয় করে ঋণ মুক্ত হতে দাও।

মহেশ। বল—কত দিতে হবে ?

হরিশ্চন্দ্র। পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা।

মহেশ। পাঁচশো !

হরিশ্চন্দ্র। দয়া কর সর্দার, আমি সারা জীবন তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকবো। [পায়ে ধরিতে যায়]

মহেশ। আরে-রে—পায়ে হাত দিতে হবে না—আমি যে ছোট জাত—চণ্ডাল ! এই নে—টাকা দিয়ে দে ঐ ঠাকুর বাবাকে। [টাকা দেয়]

[হরিশ্চন্দ্র টাকা বিশ্বামিত্রের হাতে দেয়]

হরিশ্চন্দ্র। এই নাও রাজর্ষি তোমার দক্ষিণা। আশীর্বাদ কর—জীবন দিয়ে যেন আমি ধর্মের মর্যাদা রাখতে পারি।

বিশ্বামিত্র। আশীর্বাদ ! কি বলে আশীর্বাদ করব—আশীর্বাদের ভাষা যে আমি হারিয়ে ফেলেছি ! নিজেও আমি হারিয়ে গেছি। ওগো ব্রহ্মণ্যদেব, সাড়া দাও—সাড়া দাও ! কেন আমার হৃদয়ের মধ্যে তোমাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না !

হরিশ্চন্দ্র। বল ঋষি—বল—আমি ঋণ মুক্ত ?

বিশ্বামিত্র। ঋণ মুক্ত।

হরিশ্চন্দ্র। ঋণ মুক্ত !

বিশ্বামিত্র। ঋণ মুক্ত— [প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি শান্তি—কি তৃপ্তি ! আজ আমি ঋণ মুক্ত সর্দার—ঋণ মুক্ত।

মহেশ। জানিস ব্যাটা, এতদিন আমি একটা মনের মত মানুষ খুঁজছিলাম। আজ তোকে কিনে নিয়ে মনে হচ্ছে একটা কাজের মত কাজ করেছি।

হরিশ্চন্দ্র। সর্দার—

মহেশ। হ্যাঁ ভালো কথা, কি নাম রে তোর ?

হরিশ্চন্দ্র। আমার নাম—হরিশ—চ—

মহেশ। কি বললি—হরিশ ? ভালো নাম—ভালো নাম। আমার নাম মহেশ, তোর নাম হরিশ। চল ব্যাটা চল—আমি তোকে শ্মশানের কাজ বুঝিয়ে দেবো। আজ থেকে তুই আমার ব্যাটা হয়ে গেলি। মহেশ চণ্ডালের ব্যাটা হরিশ চণ্ডাল— [প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। মহেশ চণ্ডালের ব্যাটা হরিশ চণ্ডাল। বাঃ—চমৎকার ! সংসারের এই রঙ্গমঞ্চে বিধাতার এক অপূর্ব খেলা ! রাজা হরিশ্চন্দ্র আজ থেকে হরিশ চণ্ডাল—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

মহেন্দ্রর বাড়ী।

মহেন্দ্রর প্রবেশ।

মহেন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—সত্যিই আজ আমি ভাগ্যবান ! বিক্রমজিৎ আমার প্রকৃতই বন্ধু ! তাই আজ আমি সৌভাগ্যের শীর্ষে উঠতে পেরেছি —অযোধ্যার প্রধান সেনাপতি হয়েছি। ময়নাও রানী হতে চলেছে। না—আর দেরী করবো না, বন্ধুর ইচ্ছে পূর্ণ করতে আজ আবার আমাকে ধ্বংস-লীলায় মেতে উঠতে হবে।

সন্ধ্যার প্রবেশ ।

সন্ধ্যা । কি সেনাপতিমশাই, আজ আবার কটা মন্দির ধ্বংস করবে ?

মহেন্দ্র । সন্ধ্যা !

সন্ধ্যা । যাও—যাও—দেরী করছ কেন । আরও কয়েকটা মন্দির কয়েকটা আশ্রম ধ্বংস কর, আরও কিছু ধার্মিক লোককে বন্দী করে এনে কারাগারে আটকে রাখো । তারপর প্রমোদোদ্যানে গিয়ে দেহপসারিণীদের সঙ্গে রঙ্গরসে মত্ত হয়ে নরক যাত্রার পথটা একেবারে পরিষ্কার করে ফেলো ।

মহেন্দ্র । আবার তুমি আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছো !

সন্ধ্যা । ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—তাই কখনও হয় ! তুমি যে সেনাপতি হয়েছো, অনেক অর্থ উপার্জন করছো—আমি কি তোমাকে জ্ঞান দিতে পারি । তবে হ্যাঁ—একটা সত্যিকথা না বলে পারছি না—

মহেন্দ্র । কি তোমার সত্যি কথা ?

সন্ধ্যা । এত পাপ কিন্তু ধর্মে সইবে না ।

মহেন্দ্র । তোমার ধর্ম নিয়ে তুমি থাকো । কেন বার বার সেই একই কথা বলে আমাকে বিরক্ত কর ! বলেছি তো—তোমার কোন কথাই আমি শুনবো না ।

সন্ধ্যা । তবু যে না বলে পারিনা ।

মহেন্দ্র । কেন পার না ?

সন্ধ্যা । আমি যে তোমার স্ত্রী ।

মহেন্দ্র । স্ত্রীর কাজ স্বামীর আদেশ পালন করা—তার কাজে বাধা দেওয়া নয় ।

সন্ধ্যা । বাধা আমি দিতাম না—যদি ধর্ম পথে চলতে ।

মহেন্দ্র। সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা। দেখ—দেখ স্বামী, নামতে নামতে তুমি আজ কোথায় নেমে গেছো। বাবাকে বন্দী করেছো, কত মন্দির কত আশ্রম ধ্বংস করেছ—তোমার পাপের মাত্রা আজ ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। আর কেন—এইখানেই শান্ত হও, এইভাবে মানুষের অভিশাপ আর কুড়িয়ে নিওনা।

মহেন্দ্র। থামো, আমি ঐ অভিশাপ টভিশাপ গ্রাহ্য করি না। রাজার আদেশ পালন করাই আমার কাছে একমাত্র কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যা। এ কর্তব্য জ্ঞান তখন কোথায় ছিল স্বামী, যখন মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে! আজ বুঝি বিক্রমজিৎ অর্থ আর উচ্চপদ দিয়ে তোমার মাথাটা কিনে নিয়েছে, তাই কর্তব্যটা একটু বেশী করছো—কি বল?

মহেন্দ্র। তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনা। এখুনি আমাকে—

সন্ধ্যা। না—আমি তোমাকে যেতে দেবোনা।

মহেন্দ্র। যেতে দেবে না!

সন্ধ্যা। না—না—না, অধার্মিক রাজার আদেশে আর তোমাকে মানুষের সর্বনাশ করতে দেবোনা।

মহেন্দ্র। কিন্তু বাধা দিয়েও তুমি আটকে রাখতে পারবে না সন্ধ্যা। রাজার আদেশ আমি পালন করবোই করবো।

সন্ধ্যা। ভুলে যেওনা—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ভগবান ঘুমিয়ে নেই। তাঁর নিক্তিধরা শাস্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না জহ্লাদ।

মহেন্দ্র। সাবধান সন্ধ্যা, ভুলে যেওনা—আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে। সে সীমা লঙ্ঘন করলে তোমাকেও আমি—

সন্ধ্যা। বন্দী করে কারাগারে রাখবে? গলা টিপে হত্যা করবে?

তাই কর—তাই কর, তবু আমি বলবো—তুমি মহাপাপী—তুমি নির্মম—তুমি জহ্লাদ।

মহেন্দ্র। বুঝলাম—মৃত্যুই তোমার বিধিলিপি—[তরবারি তোলে]

সত্যসন্ধের প্রবেশ।

সত্যসন্ধ। দাঁড়াও মহেন্দ্র, অনেক পাপতো করেছো—নারীহত্যার পাপটা আর নাইবা করলে।

মহেন্দ্র। একি—ভূতপূর্ব রাজ-পুরোহিত!

সত্যসন্ধ। এ তুমি কি করছো মহেন্দ্র! মরীচিকার মায়ায় ভুলে মরুভূমির মধ্যে কেন ছুটে চলেছো? ও পথে জল নেই—আছে শুধু রাশি রাশি উত্তপ্ত বালি। তোমার সর্বশরীর ঝলসে দেবে—কিন্তু জলের অভাব কোনদিনই পূর্ণ হবে না।

মহেন্দ্র। তুমিও কি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছো রাজ-পুরোহিত?

সত্যসন্ধ। ঠিক তাই। আমি যে রাজ-পুরোহিত, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের হিত-কামনা করাই যে আমার কর্তব্য!

মহেন্দ্র। সে কর্তব্য তুমি অন্যকে দেখাও গিয়ে—আমার কাছে কোন ফল হবে না।

সত্যসন্ধ। ভেবে দেখ মহেন্দ্র, যে দেশে ধর্ম-প্রাণ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন, ধর্মের মর্যাদা রাখতে সব কিছু দান করে দিয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে এক-বস্ত্রে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন, পথে পথে ভিক্ষে করেছেন, দক্ষিণার ঋণ শোধ করতে স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করে নিজে চণ্ডালের দাসত্ব করছেন—তবু ধর্মকে তিনি ত্যাগ করেননি।

মহেন্দ্র। রাজ-পুরোহিত—

সত্যসন্ধ। সেই দেশেরই ছেলে হয়ে তুমি আজ তোমার জন্মভূমির

উপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছো, ধর্মকে পদদলিত করে পাপের পঙ্কিল নরকে ছুটে চলেছো !

সন্ধ্যা। শুনছো—শুনছো—ঠাকুরমশাই কি বলছেন শুনছো ?

সত্যসন্ধ। জল বুদ্‌বুদের মতই ক্ষণস্থায়ী মানুষের জীবন—আজ আছে কাল নেই। কি হবে ছার অর্থের প্রাচুর্য্যে—কি হবে ছার সৈন্যাপত্য পদ নিয়ে—ধর্ম ছাড়া কিছুইতো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে কেন মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে এমনিভাবে পাপের বোঝা মাথায় বহন করছো ? জানোনা ধর্মসভার বিচার ? জানোনা পাপীর কি পরিণাম ? এই দেখ—[একটি বৃহদকার ছবি বের করে দেখায়, তাতে পাপীদের নানাবিধ শাস্তির দৃশ্য আঁকা আছে] এই দেখ—লোভীর শাস্তি, এই দেখ নরহত্যার শাস্তি, পিতৃ নির্যাতনকারীর শাস্তি।

ময়নার প্রবেশ।

ময়না। দাদা—দাদা—একি ঠাকুর, আপনি এখানে !

মহেন্দ্র। কি ব্যাপার রে ময়না, হঠাৎ তুই রাজ-প্রাসাদ থেকে—

ময়না। রাজ-প্রাসাদ থেকে নয় দাদা, নরক থেকে আসছি।

মহেন্দ্র। নরক থেকে ! তার মানে ?

ময়না। মানে—বিক্রমজিৎ মানুষ নয়—বর্ণ-চোরা শয়তান—লম্পট—শঠ—প্রবঞ্চক !

সন্ধ্যা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ ঠাকুরঝি, দুদিন আগেও যার গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে আমাকে অপমান করেছিলে—আজ তাকে এত গালি দিচ্ছো কেন ?

ময়না। বৌদি—বৌদি—

সন্ধ্যা। অমন সুন্দর রূপ, অমন মিষ্টি মিষ্টি কথা—এর মধ্যেই সব তেতো হয়ে গেল !

ময়না। ভুল করেছি বৌদি—ভুল করেছি। তোমার কথা না শুনে—তোমাকে অপমান করে আমি ভুল করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর! আমি বুঝতে পারিনি—সে আমাকে এইভাবে প্রতারণা করবে, এই হীন জঘন্য প্রস্তাব দেবে!

মহেন্দ্র। জঘন্য প্রস্তাব!

ময়না। কি বলছো দাদা, সেকথা বলতে গেলে লজ্জা এসে আমার গলা টিপে ধরছে, ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে—ওঃ!

সন্ধ্যা। } ময়না—
মহেন্দ্র। }

ময়না। না-না—তবু আমি বলবো। শোন দাদা, সেই শয়তান আমাকে ছলনায় ভুলিয়ে প্রমোদোগ্যানে নিয়ে গিয়ে—

মহেন্দ্র। প্রমোদোগ্যানে কেন?

ময়না। বলে—আমাকে সে বিয়ে করবে না। আমাকে দেহপসারিণী হতে হবে। রাজপুরুষদের মনোরঞ্জন করতে হবে।

মহেন্দ্র। কি—এত বড় কথা!

সন্ধ্যা। শোন স্বামী—ভাল করে শোন, কি সুন্দর তোমার বন্ধুর চরিত্র।

মহেন্দ্র। তারপর—?

ময়না। আমি তার কথায় রাজি হইনি বলে—

সত্যসন্ধ। বিক্রমজিতের আদেশে তিনজন রাজকর্মচারী তাদের পাপ লালসা চরিতার্থ করতে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মহেন্দ্র। এতদূর—!

ময়না। এমন সময় এই ঠাকুরমশাই সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন। নইলে কি যে হোত তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

মহেন্দ্র। বিক্রমজিৎ—শয়তান বিক্রমজিৎ—!

সত্যসন্ধ। এখন বুঝতে পারছো মহেন্দ্র, কার কথায় তুমি বিবেক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে জন্মদাতা পিতাকে, ধর্মপ্রাণ মন্ত্রীকে বন্দী করে কারাগারে রেখেছো? বুঝতে পারছো কেমন সে বন্ধু যার কথায় তুমি ধ্বংস লীলায় মত্ত হয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের অভিশাপ মাথা পেতে নিয়েছো?

সন্ধ্যা। কি হল স্বামী, চুপ করে আছো কেন? আমাকে গলাটিপে মারো, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও—?

মহেন্দ্র। ক্ষমা কর সন্ধ্যা—আমাকে ক্ষমা কর! শয়তানের প্ররোচনায় তোমাকে ভুল বুঝে যে ভুল আমি করেছি—আর তা করবো না। আজ আমার কাছে সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে—আবার আমার বিবেকের দরজা খুলে গেছে।

সত্যসন্ধ। তাই যদি হয়—তবে যত অন্যায় যত পাপ তুমি করেছ—এখন তার সংশোধন কর।

মহেন্দ্র। সংশোধন করবো—সংশোধন করবো—সব ভুলের আমি সংশোধন করবো।

ময়না। আমাকে লাঞ্ছিত করার প্রতিকার কর।

সন্ধ্যা। যে শয়তান তোমাকে মহাপাপী সাজিয়েছে—তার উপর প্রতিশোধ নাও।

মহেন্দ্র। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—

সত্যসন্ধ। বুঝিয়ে দাও ঐ বিক্রমজিৎকে—লোভে পড়ে মোহে ভুলে যে মনুষ্যত্ব তুমি হারিয়েছিলে—আবার তা ফিরে পেয়েছো, আর তুমি ধর্মের অপমান করবে না, ধর্মপ্রাণ হরিশ্চন্দ্রের এই ধর্মরাজ্যের বুকে আর তুমি অধর্মের লীলা হতে দেবেনা।

মহেন্দ্র। তাই হবে ঠাকুর—তাই হবে। আমি রাজ্যের প্রতিটি ঘরে

ঘরে গিয়ে আমার অপরাধের জন্যে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো। তারপর তাদের নিয়ে অধার্মিক বিক্রমজিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবো। সেই মহাপাপীকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে দিয়ে আবার এই রাজ্যকে আমরা ধর্মরাজ্য করে গড়ে তুলবো— [প্রস্থান।

সত্যসন্ধ। যাক, আকাশ মেঘমুক্ত, ঝড়ের সংকেতও থেমে গেছে। এইবার দেখবো—অধর্ম তুমি কত শক্তিমান।

উভয়ে। ঠাকুরমশাই—

সত্যসন্ধ। তোমারই পুণ্য ফলে আজ মহেন্দ্রর মনের ময়লা কেটে গেছে মা, আর কোন ভয় নেই। সব সময় মনে রেখো—যথা ধর্ম তথা জয়— [প্রস্থান।

উভয়ে। যথা ধর্ম তথা জয়—

[উভয়ের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

শ্মশান ঘাট।

হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। জ্বলছে—জ্বলছে—চিতার আগুন ধু-ধু করে জ্বলছে: আজ যারা আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ধন, আমার দৌলত বলে চিৎকার করছে—তাদের সবাইকে একদিন এইখানে আসতে হবে। দীন দরিদ্র থেকে আরম্ভ করে রাজা মহারাজা কেউ বাদ যাবে না। সবাই একদিন এই রকম চিতায় শয়ন করবে, আর ঐ সর্বগ্রাসী আগুন তাদের

পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। একি—আমার বুকখানা এইভাবে জলে যাচ্ছে কেন! কেন বার বার রোহিতের সেই কচি মুখখানা আর শৈব্যার সেই জল ভরা চোখ দুটো আমার সামনে ভেসে উঠছে! ঐ—ঐ আবার—আবার সেই কথা বাতাসে ভেসে আসছে—"বাবা, আমি কাল থেকে না খেয়ে আছি, বাবা, আমি কাল থেকে না খেয়ে আছি"। ওঃ—বাবা মহেশ্বর—!

মহেশ চণ্ডালের প্রবেশ

মহেশ। হরিশ—

হরিশ্চন্দ্র। কে? একি—সর্দ্দার! তুমি আবার ঘুম থেকে উঠে এলে কেন? আমিতো ঠিক মত কাজ করে যাচ্ছি।

মহেশ। তা জানি—তুই কাজে ফাঁকি দিবি না। কিন্তু সারারাত তুই একা শ্মশানে থাকবি, যদি তোর ভয় করে—তাইতো ঘুম থেকে উঠে এলাম।

হরিশ্চন্দ্র। না-না সর্দার, তুমি বিশ্রাম করতে যাও; ভয় ডর আমার নেই। তাছাড়া এই শ্মশান যে মানুষের কাছে মহা-তীর্থক্ষেত্র। যেখানে বাবা বিশ্বনাথ বিচরণ করেন, প্রতিনিয়ত হরিধ্বনি হয়, সেখানে কি ভয় থাকতে পারে!

মহেশ। ঠিক বলেছিস ব্যাটা—ঠিক, এখানে ভয় থাকতে পারে না। হ্যাঁরে, আজ কটা মড়া জ্বালিয়েছিস?

হরিশ্চন্দ্র। মোট পাঁচটা।

মহেশ। সকলের কাছ থেকে কড়িটড়ি গুণে নিয়েছিস তো?

হরিশ্চন্দ্র। চারজনের কাছ থেকে নিয়েছি সর্দার।

মহেশ। আর একজন?

হরিশ্চন্দ্র। দিতে পারেনি সর্দার। গরীব মানুষ—কড়ি দেবার ক্ষমতা ছিল না। অনেক কান্নাকাটী করতে লাগল।

মহেশ। তাই তার কাছ থেকে কড়ি না নিয়েই মড়া জ্বালিয়ে দিয়েছিস ?

হরিশ্চন্দ্র। কি করবো সর্দার, তার চোখের জল যে আমি সহ্য করতে পারলাম না !

মহেশ। না-না, ব্যাটা এমন কাজ আর করবি না। আগে বিশ কাহন করে কড়ি গুণে নিবি—তবে মড়া জ্বালাবি। আর যারা দিতে পারবে না—তাদের কাপড়ের আধখানা করে কেটে নিবি।

হরিশ্চন্দ্র। সর্দার—

মহেশ। হ্যাঁ বেটা, দুফোঁটা চোখের জল আর দুটো মিষ্টি কথায় গলে গেলে চলবে না, বুঝলি ?

হরিশ্চন্দ্র। তাই হবে সর্দার, তোমার এই আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

মহেশ। হ্যাঁ, একটু কড়া না হলে ঘাটোয়ালের কাজ করা যায় না। এই যাঃ—আসল কাজেই ভুল !

হরিশ্চন্দ্র। কি হল সর্দার ?

মহেশ। সন্ধ্যে থেকে তুই না খেয়ে আছিস—আমি যে তোর জন্যে দুখানা রুটি এনেছি সেকথা ভুলেই গেছি। এই নে ধর, আগে খেয়ে নে—তারপর আবার কাজ কাম কর।

হরিশ্চন্দ্র। তুমি আমার জন্যে রুটি বয়ে এনেছো !

মহেশ। তাতে কি হয়েছে ?

হরিশ্চন্দ্র। তুমি প্রভু—আমি তোমার ক্রীতদাস।

মহেশ। ফের ওকথা বললে এই লাঠি মেরে তোর মাথা ভেঙ্গে দেবো।

হরিশ্চন্দ্র। সর্দার—

মহেশ। বাপ এনেছে ছেলের জন্যে, এর মধ্যে প্রভু আর দাসের কি আছে রে ? নে ধর—! হরিশ্চন্দ্রের হাতে রুটি দেয়] আমি চললাম।

হরিশ্চন্দ্র। আমাকে তুমি এতো ভালবাসো সর্দার !

মহেশ। কেন বাসবো না, তুই যে আমার ছেলে ! আমি যেমন তোকে কড়ি দিয়ে কিনে নিয়েছি—তুইও তেমনি আমাকে ধর্ম দিয়ে কিনে নিয়েছিস রে ব্যাটা—ধর্ম দিয়ে কিনে নিয়েছিস।

[প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। ওগো ভদ্র সমাজের মানুষ, দেখে যাও—যাদের তোমরা চণ্ডাল বলে ঘৃণা কর—অবজ্ঞা কর—তারাও মানুষ। তাদের মনেও প্রেম প্রীতি ভালবাসা আছে। তারাও ধর্ম পথে চলতে জানে। [নিজের হাতের রুটী লক্ষ্য করে] রুটি ! আমার হাতে রুটি ! যাই—আর দেরী করবো না। ছেলেটী আমার কাল থেকে না খেয়ে আছে। রোহি—ওঃ ভুলে যাই—ভুলে যাই—তারা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হরিশ্চন্দ্র। কে—কে ?

কুমতি। আমি গো আমি—আমাকে চিনতে পারছো না রাজা ? আমি—সেই—

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ-হ্যাঁ—চিনেছি—চিনেছি—তুমি সেই কুহকিনী—সেই মায়াবিনী !

কুমতি। কুহকিনী—মায়াবিনী—হাঃ-হাঃ-হাঃ—বল রাজা বল—যত খুসী বল—আমি তোমার উপর রাগ করবো না।

হরিশ্চন্দ্র। সেদিন তো ছলনা করে আমাকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে, আজ আবার এখানে এসেছো কেন ?

কুমতী। তোমাকে ভুলতে পারিনি বলে। তাইতো কতদুর থেকে কত কষ্ট করে এই শ্মশানে এসে পৌছেছি। বল রাজা বল—এইবার তুমি আমার মনের আশা পূর্ণ করবে ?

হরিশ্চন্দ্র। দেখছো—সামনে ধুধু করে চিতার আগুন জ্বলছে ?

কুমতি। দেখেছি।

হরিশ্চন্দ্র। জানো—ঐ আগুনে একটা মৃত মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ?

কুমতি। জানি।

হরিশ্চন্দ্র। যদি চাও—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমি হাসতে হাসতে ঐ চিতায় প্রবেশ করতে পারি।

কুমতি। রাজা—

হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু তোমার ঐ পাপ লালসা কোনদিনই আমি পূর্ণ করতে পারবো না।

কুমতি। কেন পারবে না? তখন না হয় তুমি রাজা ছিলে, রানী শৈব্যা তোমার পাশে ছিল—তাই আমাকে অবজ্ঞা করেছিলে, কিন্তু এখন তো তুমি সব হারিয়েছ, এখন আর কিসের বাধা—কিসের ভয় ?

হরিশ্চন্দ্র। ধর্মের ভয়।

কুমতি। ধর্ম!

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ—সব হারালেও ধর্মকে তো হারাইনি!

কুমতি। ধর্ম—ধর্ম—ধর্ম, ধর্মকে আঁকড়ে থেকে কি পেয়েছো রাজা? রাজ্য হারিয়েছো, স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করেছো, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব করছো।

হরিশ্চন্দ্র। তবু আমার মনে একটাই শান্তি—আমি যা করেছি ধর্ম রক্ষার জন্যেই করেছি, অধর্মের কাছে মাথা নত করিনি।

কুমতি। এখনও আমার কথা শোন রাজা, একবার আমার প্রেমের আহ্বানে সাড়া দাও, একটিবার আমার দেহ-আঙ্গিনায় ধরা দাও—আবার তুমি সব ফিরে পাবে।

হরিশ্চন্দ্র। সব ফিরে পাবো ?

কুমতি। আমার কথায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আবার তোমাকে সব কিছুই ফিরিয়ে দেবে।

হরিশ্চন্দ্র। সব ফিরিয়ে দেবে ?

কুমতি। আবার তুমি অযোধ্যার রাজা হবে, স্ত্রী-পুত্র ফিরে পাবে। পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি—সবাই তোমাকে মাথায় করে রাখবে।

হরিশ্চন্দ্র। আবার আমি রাজা হব—স্ত্রী-পুত্র ফিরে পাবো—পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কুমতি। বল—বল রাজা, আমার প্রস্তাবে—

হরিশ্চন্দ্র। তোমার প্রস্তাবে আমি থুতকার দিই !

কুমতি। রাজা—

হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রকে লোভ দেখিয়ে জয় করা যায় না নারী। যদি পারো—মায়ের দাবী নিয়ে ছেলের কাছে এসো, বোনের ভালবাসা নিয়ে ভাইয়ের কাছে এসো—আমি তোমাকে মাথায় করে রাখবো। কিন্তু এই জঘন্য প্রস্তাব নিয়ে এলে এইভাবেই অপমান করে ফিরিয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

কুমতি। বেশ, তবে ভীষণ হতে ভীষণতর দুঃখকে বরণ করার জন্যে তুমিও প্রস্তুত থেকো রাজা। [প্রস্থান।

চতুর্দশ দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদ।

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রমজিৎ। আমি জয়ী—আমি জয়ী—ধর্মের সাথে শক্তি পরীক্ষায় আমি জয়ী। কোথায় ধর্ম—কোথায় তোমার অস্তিত্ব! আজ আমি জগৎবাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো—ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই, ধর্ম শক্তিহীন।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। বিক্রমজিৎ!

বিক্রমজিৎ। কে? একি—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র!

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ—আমি। বল—কার আদেশে রাজ্যের শতশত মন্দির ধ্বংস হয়েছে?

বিক্রমজিৎ। আমার আদেশে।

বিশ্বামিত্র। কার আদেশে নিরীহ নির্বিবাদী ঋষিদের আশ্রমে অগ্নি-সংযোগ করা হয়েছে?

বিক্রমজিৎ। আমার আদেশে।

বিশ্বামিত্র। তবে আমার আশ্রমও ধ্বংস করা হয়েছে তোমারই আদেশে?

বিক্রমজিৎ। সত্য।

বিশ্বামিত্র। কারণ?

বিক্রমজিৎ। কারণ আমার রাজ্যে আমি ধর্মস্থানের কোন অস্তিত্বই আর রাখবো না।

বিশ্বামিত্র। তোমার রাজ্য!

বিক্রমজিৎ। নিশ্চয়ই। আমিই এখন অযোধ্যার রাজা।

বিশ্বামিত্র। ক্ষমতার উচ্চাসনে বসে ভুলে যাচ্ছো বিক্রমজিৎ—রাজ্য আমার, রাজা—এই রাজর্ষি বিশ্বামিত্র। তুমি শুধু আমার প্রতিভূ।

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ভুল ঋষি—ভুল। কথায় বলে—শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ। ফল-মূল আহারি বনচারী ভিক্ষুক তুমি—তোমার আবার রাজ্য কিসের! রাজ্যটা যেমন তুমি একজনের কাছ থেকে ছলনা করে ছিনিয়ে নিয়েছিলে, তেমনি আমিও তোমার কাছ থেকে ছলনা করে নিয়ে নিয়েছি।

বিশ্বামিত্র। শঠ—প্রবঞ্চক—মিথ্যাবাদী—

বিক্রমজিৎ। সাবধান ঋষি, সংযত হয়ে কথা বল! নইলে অন্যান্য বন্দীদের মত তোমাকেও আমি বন্দী করে কারাগারে রাখতে বাধ্য হবো।

দেবানিকের প্রবেশ।

দেবানিক। হায়—হায়—হায় গুরুদেব, একি অঘটন! শেয়াল আজ সিংহকে চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলছে!

বিশ্বামিত্র। দেবানিক—

দেবানিক। হ্যাঁ গুরুদেব, অনেকদিন ধরে আপনাকে দেখার জন্যে মনটা ছটফট করছিলো। তাই যখন শুনলাম আপনি ফিরে এসেছেন—তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। হাজার হোক—অনেকদিন শিষ্যত্ব করেছিতো। যাক—বলুন কেমন আছেন? শরীর-টরীর ভালতো? হরিশ্চন্দ্রের মাথাটা খেয়ে হজম হয়েছে তো?

বিশ্বামিত্র। চুপ কর বাচাল!

দেবানিক। সেকি গুরুদেব, এখনই তো কথা বলার সময় এসেছে; এখন কি আর চুপ করে থাকতে পারি!

বিশ্বামিত্র। চুপ না করলে—চিরদিনের মত আমি তোর বাকশক্তি বন্ধ করে দেবো।

বিক্রমজিৎ। সে শক্তি তোমার আর নেই ঋষি।

বিশ্বামিত্র। বিক্রমজিৎ—

বিক্রমজিৎ। যাও—যাও, তোমার ঐ দীর্ঘ জটাজাল আর ঐ রক্ত-চক্ষুকে বিক্রমজিৎ ভয় করে না।

বিশ্বামিত্র। ভয় কর না!

বিক্রমজিৎ। না-না। এখনও যদি তুমি আমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে না যাও তাহলে গলাধাক্কা দিয়ে—

বিশ্বামিত্র। কি—এতবড় অপমান! আরে-রে নরাধম, বিশ্বামিত্রের শক্তির পরিচয় পাসনি—তাই তোর স্পর্দ্ধার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দেখ—দেখ তবে মহাপাপী, এই ফল-মূল আহারি ব্রাহ্মণের শক্তির প্রভাব! এখুনি—এই মুহূর্তে আমার অভিশাপে তোর ঐ পাপদেহ ভস্মীভূত হোক।

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হ'লনা ব্রাহ্মণ—তোমার অভিশাপে আমার কিছুই হ'লনা।

দেবানিক। কি হ'ল গুরুদেব, মাছি মারতে গালে চড়! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—গলায় দড়ি দিন—গলায় দড়ি দিন।

বিশ্বামিত্র। একি হ'ল—একি হ'ল—বিশ্বামিত্রের অভিশাপ ব্যর্থ হয়ে গেল! কোথায় বীজমন্ত্র—কোথায় গায়ত্রী—কোথায় ব্রহ্মণ্যদেব! সত্যই তোমরা আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছ! সাড়া দাও ব্রহ্মণ্যদেব—সাড়া দাও—[উন্মাদের ন্যায়]

বিক্রমজিৎ। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কোন লাভ হবেনা।

ঋষি। আমারই ছলনায় আজ তুমি মণিহারা ফণী—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিশ্বামিত্র। ব্রহ্মণ্যদেব—ব্রহ্মণ্যদেব—[উন্মাদের ন্যায়]

দেবানিক। গুরুদেব, এই জন্যই বলে—যেমন কর্ম তেমন ফল। আপনার এই অধঃপতন দেখে আমারই যে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে!

বিশ্বামিত্র। দেবানিক—দেবানিক—

দেবানিক। কি করলেন গুরুদেব—কি করলেন। এর চেয়ে যদি আপনি গোটা পৃথিবীটাকে ভস্ম করে ফেলতেন—তাতেও যে এত দুঃখ হতোনা।

বিশ্বামিত্র। ওঃ—কি করেছি—কি করেছি আমি! "ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কারে আজ আমি কোথায় নেমি গেছি!" তোরা কত বারণ করেছিস—আমি শুনিনি, তাই আজ হাতে হাতে ফল পেয়েছি—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আজ মৃত্যু হয়েছে। ওগো ব্রহ্মণ্যদেব, সাড়া দাও—সাড়া দাও—!

দেবানিক। এখনও সময় আছে গুরুদেব, এখনও কথা শুনুন, হরিশ্চন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চান, তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিন—তাহলে হয়তো আপনার পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে।

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক বলেছিস দেবানিক, আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমি হরিশ্চন্দ্রের কাছে যাবো, আমার কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইবো—

সত্যসন্ধের প্রবেশ।

সত্যসন্ধ। তার আগে তোমাকে মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে যেতে হবে রাজর্ষি!

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠের কাছে— !

সত্যসন্ধ। হ্যাঁ। তিনিই তোমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেছিলেন। তুমি সেই ব্রাহ্মণত্বের অপমান করেছ—তাই তাঁর কাছেই তোমাকে আগে যেতে হবে। তাঁর দেখানো পথ ধরে চলতে হবে। তবেই আবার তুমি সব কিছু ফিরে পাবে।

বিশ্বামিত্র। পাবো—পাবো—আবার আমি ব্রাহ্মণত্ব ফিরে পাবো ?

সত্যসন্ধ। অনুতাপ যখন জেগেছে—তখন নিশ্চয়ই ফিরে পাবে। আবার তোমার আশীর্বাদে মরা গাছে ফুল ফুটবে, মুমূর্ষু জীবন ফিরে পাবে—ত্রিভুবন আবার তোমার জয়গান গাইবে।

বিশ্বামিত্র। তাই হবে—তাই হবে সত্যসন্ধ, এখুনি আমি মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে যাবো। আবার আমি কঠোর সাধনা করে আমার হৃতশক্তি ফিরিয়ে আনবো। কোথা গুরু বশিষ্ঠ, আমাকে কৃপা কর—আমাকে পথ দেখাও—আলো দেখাও—আলো দেখাও—

[প্রস্থান।

দেবানিক। দাঁড়ান গুরুদেব, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আবার আপনার শিষ্যত্ব করবো। আবার আপনার হোম যজ্ঞের আয়োজন করে দেবো। আপনার পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে দেবো—

[প্রস্থান।

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি হ'ল ধর্ম, এখনও কি তুমি আমাকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করবে না ?

সত্যসন্ধ। কোনদিনই না।

বিক্রমজিৎ। তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত আজ চণ্ডালের দাসত্ব করছে।

সত্যসন্ধ। তবু সে ধর্মকে ত্যাগ করে অধর্মের কাছে মাথা নত করেনি।

বিক্রমজিৎ। মহারানী শৈব্যা আজ কুমতির পদসেবা করছে।

সত্যসন্ধ। সহধর্মিণীর কর্ত্তব্য পালন করে ধর্মের মান চির উজ্জ্বল করে রেখেছে।

বিক্রমজিৎ। ধর্মরাজ্য অযোধ্যানগরী আজ এই অধর্মের পদানত হয়েছে।

সত্যসন্ধ। দপ করে যেমন জ্বলে উঠেছো—তেমনি একটি ফুৎকারে আবার নিভে যাবে।

বিক্রমজিৎ। অযোধ্যার প্রজাগণ আজ আমারই অনুগত—আমারই সেবক।

দীর্ঘকায়, রুক্ষকেশ, ক্ষিপ্তাবস্থায় তলোয়ার হাতে রাঘব রায়ের প্রবেশ।

রাঘব। মিথ্যা কথা। প্রজাগণ একমাত্র ধর্মপ্রাণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের অনুগত। তাঁকে ছাড়া তারা আর কাউকে রাজা বলে স্বীকার করে না।

বিক্রমজিৎ। একি—মন্ত্রী রাঘব রায়! তুমি কারাগার থেকে—

রাঘব। হ্যাঁ, তোমার কাছে জবাব চাইতে এসেছি।

বিক্রমজিৎ। কিসের জবাব?

রাঘব। কেন তুমি শান্তিময় রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলছো? কেন দেবমন্দির ধ্বংস করে দেবতার অপমান করেছো? কেন আশ্রম জ্বালিয়ে দিয়ে মুনি ঋষিদের উপর অকথ্য নির্য্যাতন করেছো—আর কেনই বা নারীর সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছো?

বিক্রমজিৎ। রাঘব রায়—

রাঘব। জবাব দাও বিক্রমজিৎ—জবাব দাও—।

বিক্রমজিৎ। না—জবাব দেবনা—।

কেশবের প্রবেশ।

কেশব। সহজে জবাব না দিলে এই তলোয়ারের খোঁচায় জবাব আদায় করে নেবো।

বিক্রমজিৎ। কেশব চাষী—তোমার হাতেও তলোয়ার!

কেশব। হ্যাঁ। তলোয়ার ধরতে জানিনা সত্যি—তবুও ধরেছি। এককোপে না পারলেও তোমাকে আমি পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটবো।

সত্যসন্ধ। শুরু হয়ে গেছে বিক্রমজিৎ, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। এইবার দেখ—কার জয় আর কার পরাজয়—।

বিক্রমজিৎ। ও—তাহলে তুমিই এদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দিয়েছো?

মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। না—আমি মুক্ত করে দিয়েছি।

বিক্রমজিৎ। সেকি মহেন্দ্র, তুমি বিশ্বাসঘাতক!

মহেন্দ্র। ভুল বন্ধু—ভুল। একদিন তোমার প্ররোচনায় আমি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম সত্যি, কিন্তু আজ আবার আমি প্রকৃত রাজভক্ত হয়েছি। তাইতো তাঁর এই ধর্মরাজ্যকে রক্ষা করার জন্যে কারাগারের সমস্ত বন্দীদের আমি মুক্তি দিয়েছি। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রজাকে তোমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে রাজদ্বারে সমবেত করেছি। সকলের হাতে আমি শাণিত তরবারি তুলে দিয়েছি।

সত্যসন্ধ। বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠেছে বিক্রমজিৎ, এইবার তোমার মহাপ্রস্থানের পালা।

কেশব। মন্ত্রীমশাই, আজ আমার আনন্দের সীমা নেই—আমার

মহেন্দ্রকে আবার আমি আগের মত করে ফিরে পেয়েছি। কী আনন্দ! কী আনন্দ।

বিক্রমজিৎ। মহেন্দ্র, আমি তোমাকে সৌভাগ্যের উচ্চ আসনে বসিয়েছি।

মহেন্দ্র। মিথ্যে কথা। তুমি আমাকে পাপের পঙ্কিল নরকে টেনে নিয়ে গেছো।

কেশব। ঠিক বলেছিস ব্যাটা—ঠিক বলেছিস। ওরই জন্য তোকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম—ওরই জন্যে আমার সোনার সংসারে ভাঙ্গন ধরেছিল। আজ আমি কড়ায় গণ্ডায় তার শোধ তুলে নেবো।

বিক্রমজিৎ। বটে—!

রাঘব। নেমো এসো বিক্রমজিৎ ঐ ধর্ম সিংহাসন থেকে। যে সিংহাসনে একদিন মহারাজ হরিশ্চন্দ্র উপবেশন করেছিলেন, সেই সিংহাসনে তোমার মত মহাপাপীকে আর আমরা বসে থাকতে দেবোনা।

সত্যসন্ধ। ব্যস, তোমার খেলা শেষ হয়ে গেল বিক্রমজিৎ, আর তোমার রাজত্ব করা হ'লনা। এইবার মাথা নীচু করে অযোধ্যা থেকে বিদায় হও।

বিক্রমজিৎ। তুমি চুপ কর সত্যসন্ধ। মহেন্দ্র, এখনও কথা শোন—আমার সহায় থাকো—আমি তোমাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করবো।

মহেন্দ্র। অর্দ্ধেক কেন বিক্রমজিৎ—সমগ্র রাজ্যটা দান করলেও আর আমি তোমার সহায় হবোনা।

বিক্রমজিৎ। মহেন্দ্র—বন্ধু—

মহেন্দ্র। বন্ধু! হাঃ-হাঃ-হাঃ—ওই সম্বোধনে আর তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না বিক্রমজিৎ, আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। ময়না তোমার স্বরূপটা প্রকাশ করে দিয়েছে। রাজপুরোহিত আমার

বিবেকের দরজায় আঘাত করে জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়েছে, আর কোন প্রলোভনেই তুমি আমাকে পাপের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

সত্যসন্ধ। হেরে গেলে বিক্রমজিৎ—তুমি একেবারে হেরে গেলে। আর বুক টান করে কথা বলার কোন ক্ষমতাই তোমার নেই।

বিক্রমজিৎ। আছে, এখনও আমার খেলা শেষ হয়নি।

কেশব। আমরাই তোমার ভবখেলা শেষ করে দেব।

নেপথ্যে। বিক্রমজিতের ধ্বংস চাই—ধ্বংস চাই—।

মহেন্দ্র। ঐ শোন—ঐ শোন—রাজদ্বারে সমস্ত প্রজাগণ তোমার ধ্বংস চায়।

বিক্রমজিৎ। ধ্বংস! আমার ধ্বংস! হাঃ-হাঃ-হাঃ—অসম্ভব! আমি অমর—আমি মৃত্যুঞ্জয়। সৃষ্টি যতদিন আছে ততদিন আমি বেঁচে আছি—বেঁচে থাকবো—কেউ কোনদিন আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না।

মহেন্দ্র। উত্তম—এখুনি তার প্রমাণ হয়ে যাক [তিনজনে একসঙ্গে তরবারি উত্তোলন করে]

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [অদৃশ্য হয়ে যায়]

রাঘব। একি—একি—মুহূর্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! মহেন্দ্র—কেশব—অনুসন্ধান কর—অনুসন্ধান কর—

সত্যসন্ধ। কোন লাভ হবেনা মহামন্ত্রী, বিক্রমজিৎ শূন্যে মিলিয়ে গেছে—ও যে মূর্তিমান অধর্ম।

সকলে। অধর্ম!

সত্যসন্ধ। হ্যাঁ। ধর্ম অধর্মের দ্বন্দ্বে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করতে বিক্রমজিৎ নাম নিয়ে অধর্ম এতদিন অযোধ্যায় প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ তার শোচনীয় পরাজয় হয়েছে, ধর্ম আজ জয়ী হয়েছে।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও আজ মোহমুক্ত। আবার অযোধ্যায় শান্তি ফিরে আসবে, আবার তোমরা তোমাদের প্রিয় রাজাকে ফিরে পাবে।

[প্রস্থান।

রাঘব। একি—সত্যসন্ধ কোথায় অদৃশ্য হ'ল! সত্যসন্ধ—সত্যসন্ধ—

কেশব।
মহেন্দ্র। } রাজ-পুরোহিত—রাজ-পুরোহিত—

রাঘব। বুঝেছি—বুঝেছি—রাজ-পুরোহিতের বেশে তুমিই সেই ধর্ম সত্যসন্ধ।

নেপথ্যে সত্যসন্ধ। যথা ধর্ম তথা জয়—

সকলে। যথা ধর্ম তথা জয়।

[সকলের প্রস্থান।

———

পঞ্চদশ দৃশ্য।

বারাণসী, কুমতির প্রাসাদ।

রোহিতাশ্বর চুলের মুঠি ধরিয়া মারিতে মারিতে কুমতির প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। আর মেরো না দিদিমা—আর মেরো না, আমাকে ছেড়ে দাও!

কুমতি। বল—বল আর রুটি চুরি করে খাবি?

রোহিতাশ্ব। তুমি বিশ্বাস কর দিদিমা, আমি রুটি চুরি করিনি—আমি চুরি করিনি।

কুমতি। একশোবার চুরি করেছিস—হাজারবার চুরি করেছিস। হাড়-হাভাতে কোথাকার! দিনরাত মায়ে পোয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি গিলছিস—তাতেও পেট ভরছে না! আবার চুরি করে খাওয়া—তার উপর মিথ্যে কথা!

রোহিতাশ্ব। না-না আমি মিথ্যে কথা বলতে জানিনা।

কুমতি। কি—আমার মুখে মুখে তর্ক—আমি মিথ্যে কথা বলতে জানিনা! দাঁড়া, আজ মেরে মেরেই তোকে শেষ করে দেবো। [প্রহার]

রোহিতাশ্ব। ওঃ, মা—মাগো—মাগো—

দ্রুত শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। কি হয়েছে—কি হয়েছে রোহিত? আমাকে অমন করে ডাকছিস কেন?

রোহিতাশ্ব। আমাকে বাঁচাও মা—আমাকে বাঁচাও—।

কুমতি। কেউ তোকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না—[আবার প্রহার করে]

শৈব্যা। একি—তুমি ছেলেটাকে অমন করে মারছো কেন মা, কি করেছে ও?

রোহিতাশ্ব। কিছু করিনি মা, দিদিমা শুধু শুধু আমাকে—

কুমতি। ফের মিথ্যে কথা! শোন বাছা শোন—তোমার ছেলের গুণের কথা শোন;—আমি রান্নাঘরে রুটি করে রেখেছিলাম, তোমার ছেলে শিকল খুলে সব রুটি চুরি করে খেয়ে নিয়েছে।

শৈব্যা। সেকি—রোহিত—!

রোহিতাশ্ব। না মা, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—আমি চুরি করিনি। দিদিমা আজ রুটি তৈরীই করেনি।

কুমতি। কি—যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! আমি রুটি তৈরী করিনি—আমি মিথ্যেবাদী! দাঁড়া—আজ তোকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে তবে আমি জলগ্রহণ করবো—[পুনঃ পুনঃ প্রহার করতে থাকে]

শৈব্যা। ওঃ ভগবান—

রোহিতাশ্ব। মা-মাগো, আমাকে মেরে ফেললে—

শৈব্যা। না-না মেরো না মা—আর মেরো না! আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি—ওকে ছেড়ে দাও! ওর বদলে তুমি যত খুশি আমাকে মারো। তবু মায়ের সামনে ছেলেকে এইভাবে মেরো না—মেরো না—!

কুমতি। না—মারবে না, ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করবে! চোর—চোরের বংশ কোথাকার।

শৈব্যা। ওকথা বলনা। যদি জানতে, ও কোন বংশের ছেলে—কার ছেলে—কে ওর বাবা—তাহলে—

কুমতি। থাক—থাক, বিন্নেস করে তোর সোয়ামীর গুণ গাইতে হবে না। যে পুরুষ মানুষ বৌ-ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, তাদের বাজারে এনে বিক্রি করে—তেমন মানুষ বেঁচে না থেকে মুখে রক্ত উঠে মরাই ভালো।

রোহিতাশ্ব। কি—তুমি আমার বাবার মরণ কামনা করছো!

শৈব্যা। ভগবান, আমাকে বধির করে দাও—বধির করে দাও!

রোহিতাশ্ব। মা—মা—

শৈব্যা। যাও বাবা—যাও, তুমি আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। সন্ধ্যে হয়ে এলো, এখুনি তোমার দাদু পূজোয় বসবেন। তাঁর জন্যে ফুল তুলে আনো।

রোহিতাশ্ব। আমি এখুনি যাচ্ছি মা—

[প্রস্থান।

শৈব্যা। মা, তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি যখন যা বলবে আমি তাই করবো—তোমার পায়ের কাঁটা আমি দাঁত দিয়ে তুলে দেবো, শুধু আমার সামনে আমার স্বামীর নিন্দে করো না। আমি সব সইতে পারবো—কিন্তু তাঁর নিন্দে সইতে পারবো না।

কুমতি। ও বাবা—"এযে দেখছি সতী কুলরানী!" সোয়ামীর নিন্দে সইতে পারবো না! তবু যদি আমার সোয়ামীর দিকে দৃষ্টি না দিতে।

শৈব্যা। কি—কি বললে মা! আমি তাঁকে বাবা বলে ডাকি, তিনি আমাকে কন্যার মত স্নেহ করেন—আর তুমি আমাকে এতবড় কথা বলতে পারলে!

কুমতি। কেন বলতে পারবো না বাছা? আমিতো আর কানা নই, সবই দেখতে পাই। দিনরাত্তির আমার মিনসের সঙ্গে গুজুর গুজুর—ফুসুর ফুসুর— ।

শৈব্যা। ভগবান, এও তুমি সইছো! এও আমাকে শুনতে হ'ল! বলে দাও—বলে দাও পরমেশ্বর, আর কত সইতে হবে? আর কত নিষ্ঠুর আঘাত তুমি আমাকে দেবে?

কুমতি। আ-হা-হা, চোখের জলে বান ডেকে যাচ্ছে! শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছো। ন্যাকা-পাজী কোথাকার! আমি যেন কচি খুকী-কিছু বুঝিনা—না! [চুলের মুঠি ধরে]

শৈব্যা। বলনা মা—আর বলনা, আর আমি সইতে পারছি না—!

কুমতি। ওঃ—সোহাগের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়, আর আমি সইতে পারছি না! বলি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ভাতারের সঙ্গে পীরিত করার সময়তো একথাটা মনে থাকে না!

শৈব্যা। মা—মা—

তীর্থনাথের প্রবেশ।

তীর্থ। কি হ'ল—কি হ'ল ব্রাহ্মণী, এই সন্ধ্যেবেলায় আবার ঝগড়া শুরু করলে কে ?

কুমতি। এসেছো ? এসো—এসো—আমার পতিদেবতা এসো। আজ তোমারও আমি পিণ্ডি চটকাবো।

তীর্থ। এ আর নতুন কথা কি ? তুমি দিন-রাত্তিরইতো আমার পিণ্ডি চটকাচ্ছো।

শৈব্যা। বাবা—বাবা—

তীর্থ। কি হয়েছে মা, তুমি অমন করে কাঁদছো কেন ?

কুমতি। ঢং—ঢং—দাসীতো আনোনি—রানী এনেছো। তাই কথায় কথায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

তীর্থ। ও, আর আমার বুঝতে বাকী নেই। নিশ্চয়ই তুমি ওকে আবার কটু কথা বলেছো।

কুমতি। যদি বলেই থাকি তাতে তোমার এত গায়ে লাগছে কেন—শুনি ?

তীর্থ। আমি যে মানুষ। এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে বিয়ে করে একে একে সব কিছু বিসর্জন দিতে বসেছি সত্য, কিন্তু মনুষ্যত্ব এখনও বিসর্জন দিতে পারিনি। তাই সতীর চোখে জল দেখলে আমারও বুকে আঘাত লাগে।

কুমতি। লাগবেই তো—লাগবেই তো। সাধে কি বলি—ঐ মাগীটাই তোমাকে—

শৈব্যা। চুপ কর মা—চুপ কর। আমাকে যা বলেছো—বলেছো, বাবার সামনে আর সেকথা উচ্চারণ করনা। আমার একমাত্র ছেলের

নামে দিব্যি করে বলছি—তোমার ধারণা ভুল। ভাগ্য বিপর্যয়ে আজ আমি দাসীবৃত্তি করলেও আমার মনের কোণে এতটুকুও কালীর দাগ নেই মা—কালীর দাগ নেই। [প্রস্থান।

তীর্থ। কি বলেছো তুমি ওকে ব্রাহ্মণী ?

কুমতি। যা সত্যি কথা—তাই বলেছি।

তীর্থ। কি তোমার সত্যি কথা ?

কুমতি। বলি—আমার টাকায় কেনা ঝি, আমি তাকে যা খুশি বলি-না কেন তাতে তোমার কি ?

তীর্থ। তাই বলে একটা নিরীহ মেয়েকে তুমি যা-তা বলবে, কারণে অকারণে নির্যাতন করবে, যখন তখন তার ছেলেটাকে ধরে ধরে মারবে—আর আমি মুখ বুজে থাকবো ?

কুমতি। ওরে বাবা—দরদ যে একেবারে উথলে উঠেছে দেখছি ! বুঝি গো—বুঝি, কোথায় যে তোমার ব্যথা—আমি সব বুঝি।

তীর্থ। কি বোঝ ?

কুমতি। ঐ ঝি-মাগী তোমাকে যাদু করেছে। আর তুমিও তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছো। তাই—

তীর্থ। ব্রাহ্মণী ! ও—এইসব কুৎসিত কথাই বুঝি তুমি ওকে বলেছো ?

কুমতি। হ্যাঁ বলেছি। কথাটাতো মিথ্যে না, আর আমার চোখে ছানিও পড়েনি। তোমাদের কীর্ত্তি-কলাপ সবই দেখতে পাই।

তীর্থ। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—এত জঘন্য তোমার মন ! এত নীচ তুমি !

কুমতি। কি—আমি নীচ ! ছিলে হত্তুকী খেকো ব্রাহ্মণ, কোনদিন জুটতো কোনদিন জুটতো না। আজ আমারই জন্যে অট্টালিকায় বাস করছো, রাজভোগ খাচ্ছো—আবার আমাকেই বলছো—নীচ !

তীর্থ। হ্যা-হ্যা—তুমি নীচ—তুমি নীচ—তুমি মিথ্যেবাদী। তোমাকে বিয়ে করে আমার জীবনটা কলুষিত হয়ে গেছে।

কুমতি। তবে যাও—ঐ ঝি-মাগীর চন্নামেত্ত খেয়ে জীবনটাকে সার্থক করে নাও।

তীর্থ। তাতেও আমার জাত যাবে না ব্রাহ্মণী।

কুমতি। সেতো আমি জানিই।

তীর্থ। আরও একটু জেনে রাখো, ঝি হলেও ঐ মেয়েটি শাপভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী। আর তুমি—নরকের কীট। যে মনোভাব তুমি আজ প্রকাশ করেছো, তাতে তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হয়!

[প্রস্থান।

কুমতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ঘৃণা করলেও আমার দুঃখ নেই। কারণ তোমার মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকেও যে আমি মোহজালে জড়িয়ে পথভ্রষ্ট করতে পেরেছি—তাতেই আমার শান্তি।

বিক্রমজিৎ ওরফে অধর্মের প্রবেশ।

অধর্ম। কুমতি—কুমতি—

কুমতি। একি—তুমি!

অধর্ম। হ্যাঁ—আমি, অযোধ্যায় আমার চরম পরাজয় হয়েছে।

কুমতি। সেকি! পরাজয়!

অধর্ম। সত্যি কুমতি, সব গুছিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু কি করে যে হঠাৎ আমার বিরুদ্ধে ধর্ম-বিপ্লব আরম্ভ হ'ল কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাই—

কুমতি। তুমি পরাজিত হয়েছো! এবারেও আমাদের পরাজয় হ'ল!

অধর্ম। না—অযোধ্যায় পরাজিত হলেও এখনও আমাদের জয়ের আশা আছে। এখনও আমরা জয়ী হতে পারি।

কুমতি। কেমন করে ?

অধর্ম। মরণ কামড় দিয়ে।

কুমতি। যথা—

অধর্ম। ছেলেটা কোথায় ?

কুমতি। ফুল তুলতে গেছে।

অধর্ম। তুমিও সেখানে যাও, ওকে মায়ের কোল ছাড়া করে দাও।

কুমতি। কিন্তু তাতেই কি আমাদের জয় হবে ?

অধর্ম। না। সেই সঙ্গে আমি যদি কোন রকমে শৈব্যার দেহে একবার কালী ছিটিয়ে দিতে পারি—তাহলেই হবে আমাদের জয়।

কুমতি। চুপ—চুপ—ঐ শৈব্যা আসছে। তুমি একটু আড়ালে যাও। আমি ওকে একবার বুঝিয়ে বলি—তোমার ইচ্ছে মতই কাজ করবে।

অধর্ম। ঠিক আছে। [প্রস্থান।

কুমতি। কই গো—সতীমায়ের সতী মেয়ে, এদিকে একটু এসো না।

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। আমাকে ডাকছো মা ?

কুমতি। হ্যাঁ বাছা। বলি খুবতো গায়ে ফু-দিয়ে বেড়াচ্ছো, কাজ-কর্ম কি নেই নাকি ?

শৈব্যা। তুমি যা যা বলেছো—সবই তো করেছি মা।

কুমতি। কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘরদোর গুছানো—সব হয়ে গেছে ?

শৈব্যা। হ্যাঁ মা, সব হয়ে গেছে।

কুমতি। তবে আর কি—আমি কেতাত্থ হয়ে গেছি! বলি ছাতে যে নিমপাতা পড়ে বোঝাই হয়ে আছে সে খেয়াল আছে? ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে না?

শৈব্যা। পরিষ্কার করেছি মা।

কুমতি। বেশ বাছা—বেশ, উ-হুঁ-হুঁ-হুঁ—[যন্ত্রণা প্রকাশ]

শৈব্যা। কি হ'ল—কি হ'ল মা—

কুমতি। পায়ে সেই বাতের ব্যথাটা আবার আরম্ভ হয়েছে।

শৈব্যা। সেকি! তুমি বস মা, আমি তোমার পা টিপে দিচ্ছি—[কুমতির পা টিপতে থাকে]

কুমতি। জানো বাছা, তুমি আমার পা টিপে দিলে আমার খুব ভালো লাগে—খুব আরাম লাগে।

শৈব্যা। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তাই তোমার সেবা করতে আমারও ভালো লাগে মা।

কুমতি। দেখো বাছা, মুখে আমি যাই বলিনা কেন—মনে মনে আমি কিন্তু তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

শৈব্যা। ভালবাসো বলেই তো ছেলেটাকে নিয়ে আমি আজও বেঁচে আছি।

কুমতি। আহা—এত সুন্দর রূপ যৌবন তোমার—সব ব্যর্থ হয়ে গেল!

শৈব্যা। মা হয়ে মেয়ের সামনে একথা বলতে নেই মা।

কুমতি। বলি কি সাধে বাছা, তোমার দুঃখে যে আমার বুকটা ফেটে যায়!

শৈব্যা। মেয়ের দুঃখে মায়ের বুকে তো ব্যথা লাগবেই।

কুমতি। তুমি এক কাজ কর বাছা—আমার এক ভাই আছে, খুব

বড়লোক—টাকা পয়সা—দাসদাসী কোন কিছুর অভাব নেই। বিয়ে করেছিল—বৌ মরে গেছে। এখন তুমি যদি তাকে বিয়ে করতে রাজী হও—

শৈব্যা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—এসব কি বলছো মা—?

কুমতি। ঠিকই বলছি বাছা। তাতে তোমার ভালই হবে, রানীর হালে দিন কাটাবে।

শৈব্যা। না-না, সে রানীত্ব আমি চাইনা মা। তার চেয়ে এই দাসীত্বই যে আমার কাছে অনেক গৌরবের।

কুমতি। কি বলছো বাছা—এতবড় সুযোগ তুমি ছেড়ে দেবে!

শৈব্যা। নারী হয়ে তুমি এই কথা বলছো মা! তুমি কি জানোনা, সতীত্বের কাছে পৃথিবীর ঐশ্বর্য তো তুচ্ছ—ইন্দ্রের অমরাবতীও মূল্যহীন?

কুমতি। কথা শোন বাছা, বুঝে দেখ।

শৈব্যা। দোহাই মা, ও কথা আর তুমি আমাকে বলনা। আমার স্বামী আমার হৃদয় সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে সেখান থেকে নামিয়ে দিয়ে অন্য পুরুষের চিন্তা করাও সতী নারীর মহাপাপ।

কুমতি। বেশ, ভাল কথায় যখন রাজী হলিনা—মর তবে দেমাক-খাকি— [পদাঘাত ও প্রস্থান।

শৈব্যা। ওঃ - ধরণী, তুমি দ্বিধা হও—আমাকে তুমি গ্রাস কর!

বিক্রমজিতের প্রবেশ।

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শৈব্যা। কে? একি বিক্রমজিৎ—তুমি এখানে!

বিক্রমজিৎ। হ্যাঁ মহারানী, আমি এখানে। একটু আগে ঐ নারী যাকে বিবাহ করার জন্য তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল—আমিই সেই।

শৈব্যা। কি—কি বললে বিক্রমজিৎ—!

বিক্রমজিৎ। যা সত্য তাই বলছি। অযোধ্যায় তোমার রূপ দেখে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তাই সেই রূপের আকর্ষণেই আমি এতদূর ছুটে এসেছি।

শৈব্যা। বিক্রমজিৎ—

বিক্রমজিৎ। এসো—ধরা দাও। কিসের বাধা—কিসের ভয়—কিসের সঙ্কোচ! আমি তোমাকে নিয়ে নতুন করে এক স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলবো।

শৈব্যা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—বিক্রমজিৎ, তুমি এত নীচ! একদিন যাকে মাতৃ-সম্বোধন করেছ—আজ তার কাছে প্রেম নিবেদন—তোমার লজ্জা করছে না! জিভটা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে না!

বিক্রমজিৎ। তোমার কোন কথাই আমার কানে যাবে না শৈব্যা। আজ আমি বধির—আজ আমি উন্মাদ। একবার, শুধু একটিবার তুমি আমার এই প্রেমালিঙ্গনে ধরা দাও প্রিয়া—!

শৈব্যা। সরে যা—সরে যা লম্পট! মনে রাখিস—এ রূপ নয়—আগুন। সতীঅঙ্গ স্পর্শ করলে এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবি।

বিক্রমজিৎ। তবু সুযোগ যখন পেয়েছি তখন কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে দেব না—[হাত ধরে]

শৈব্যা। হাত ছাড়—হাত ছাড় কামান্ধ পিশাচ! বাবা—বাবা—

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শৈব্যা। নারায়ণ—বিপদবারণ, এখনও তুমি ঘুমিয়ে আছো! এখনও কি তোমার জাগার সময় হয়নি! জাগো—জাগো—নারায়ণ, এই নরপিশাচের হাত থেকে সতীর ধর্ম রক্ষা কর!

বিক্রমজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—বৃথা চিৎকার করে কোন লাভ নেই শৈব্যা। তোমাকে রক্ষা করতে কেউ এখানে ছুটে আসবে না।

ধর্মদণ্ড হাতে সত্যসন্ধের প্রবেশ।

সত্যসন্ধ। আসবে। সতীর ধর্ম রক্ষায় ধর্মদণ্ড হাতে নিজে ধর্মই এখানে এসেছে অধর্ম।

শৈব্যা। ওঃ ভগবান—তুমি আছো—তুমি আছো—[জ্ঞান হারায়]

বিক্রমজিৎ। এখানেও তুমি—!

সত্যসন্ধ। সর্বত্রই আমি। আমি জানতাম অধর্ম, অযোধ্যা থেকে অদৃশ্য হয়ে তুমি এখানেই আসবে। তাই আমিও তোমাকে অনুসরণ করে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

বিক্রমজিৎ। ওঃ—এখানেও আমার পরাজয় হ'ল! কিন্তু মনে রেখো—আজ আমি পরাজিত হলেও তোমাকে কোনদিন শান্তিতে থাকতে দেবো না। চিরদিন তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলবে, আর এই যুদ্ধে জয়ী একদিন আমি হবোই হবো— [প্রস্থান।

সত্যসন্ধ। কিন্তু আমি জানি, তোমার এই জয়ের আশা কোনদিনই পূর্ণ হবে না। ওঠো মা—ওঠো, বিপদের ভয় কেটে গেছে। তোমার ধর্মই তোমাকে রক্ষা করেছে। যথা ধর্ম তথা জয়— [প্রস্থান।

শৈব্যা। [জ্ঞানলাভে] যথা ধর্ম তথা জয়। চলে গেছে—চলে গেছে সেই কামান্ধ পিশাচ! একি—কেউ তো নেই! তবে কে—কে কথা বললে?

দ্রুত রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। মা—মা—আমাকে যেন কিসে কামড়ালো, বড্ড জ্বালা করছে।

শৈব্যা। সেকি! কই—কোথায়? দেখি—দেখি—

রোহিতাশ্ব। এই যে কপালের উপরে। বড্ড জ্বালা করছে মা—বড্ড জ্বালা করছে—আমি সইতে পাচ্ছি না—আঃ—আঃ—

শৈব্যা। রোহিত—রোহিত—মা—বাবা—বাবা—

কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। কি হয়েছে বাছা, কি হয়েছে? অমন ডাকাত পড়ার মত চীৎকার করছো কেন?

শৈব্যা। দেখোনা মা আমার ছেলেকে যেন কিসে কামড়িয়েছে। বলছে—বড্ড জ্বালা করছে।

কুমতি। ওমা—এ যে দেখছি স্পষ্ট দাঁতের দাগ রয়েছে! শরীরটাও আস্তে আস্তে নীল হয়ে যাচ্ছে। হয়েছে—হয়েছে—আর কোন আশা নেই।

শৈব্যা। কি বলছো মা—

কুমতি। কি বলছি বুঝতে পারছো না? তোমার ছেলেকে সাপে কামড়িয়েছে।

শৈব্যা। ওঃ—ভগবান—

রোহিতাশ্ব। মা—আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে—[শৈব্যার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে]

কুমতি। পাবেই তো—পাবেই তো, তোকে যে কাল-ঘুমে পেয়েছে রে।

শৈব্যা। মা, না-না ওকথা বলে আমার বুকে বাজের আঘাত করন। মা। তাইতো কি করি—কাকে ডাকি? মা—মা—দয়া করে একজন ওঝাকে খবর দাও না, যদি সে কোন উপায় করতে পারে।

কুমতি। এই ভর অমাবস্যার রাতে ওঝা কোথায় পাবো বাছা? আর ওঝা এসেই বা কি করবে? কালে যাকে খেয়েছে, ওঝার চৌদ্দ-পুরুষের ক্ষমতা নেই যে তাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

শৈব্যা। তাহলে সত্যি সত্যিই রোহিত আমার বাঁচবে না? সত্যিই কি মায়ের বুক শূন্য করে তুই চলে যাবি বাবা! না-না তা হতে পারে না। ভগবান এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। ওগো ভগবান, আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেবো, আমার চোখের মণিকে, আমার সাত রাজার ধন মাণিককে তুমি কেড়ে নিওনা—কেড়ে নিওনা।

রোহিতাশ্ব। আঃ—মা, বাবাকে বোধহয় আর দেখা হ'ল না। আমার চোখে অন্ধকার নেমে আসছে। কই—তোমার পা ছুটো একটু এগিয়ে দাওনা মা—আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না! [প্রণাম করে] মা—[ঢলে পড়ে]

শৈব্যা। রোহিত—রোহিত! একি শরীরটা অসাড় হয়ে গেল কেন? নিঃশ্বাস পড়ছে না কেন? তবে কি সত্যি সত্যিই তুই অভাগিনী মাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলি বাবা! কথা বল রোহিত—কথা বল, একবার তুই আমাকে মা বলে ডাক—

কুমতি। কে আর ডাকবে বাছা, ওকি আর বেঁচে আছে—মরে গেছে।

শৈব্যা। রোহিত—আমার রোহিত—

তীর্থনাথের প্রবেশ।

তীর্থ। কি হয়েছে মা, দাদু ভাই কি এখনও ফুল নিয়ে ফেরেনি?

শৈব্যা। বাবা—বাবা, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে! রোহিত আমার চিরদিনের মত আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

তীর্থ। সেকি—!

কুমতি। হ্যাগো। ফুল তুলতে গিয়ে বেচারাকে সাপে কামড়েছে। ঐ দেখ কেমন মরে পড়ে আছে।

তীর্থ। দাদু—দাদুভাই—

কুমতি। একি—তুমি এমন মড়াকান্না কাঁদছো কেন। তোমার তো আর ছেলে মরেনি।

তীর্থ। তুমিও কাঁদো ব্রাহ্মণী—তুমিও কাঁদো। এমন একটা সদ্য ফোটা ফুল ভগবানের নিষ্ঠুর বিচারে আজ অকালে ঝরে গেল, এ দেখেও কি তোমার চোখের কোণে একটুও জল আসছে না ?

কুমতি। আমার এত দয়া মায়ার শরীর নয়, আর চোখের জলও এত সস্তা নয়—বুঝলে ?

তীর্থ। ব্রাহ্মণী—

শৈব্যা। রোহিত—মাণিক আমার, বলে দে—বলে দে ওরে নিষ্ঠুর—যদি কোনদিন তোর বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়—কি বলবো তাকে ? বলে দে—বলে দে—

কুমতি। আর কেঁদে কি করবে বাছা ? হাজার কাঁদলেও মরা ছেলেতো আর কথা বলবে না। তার চেয়ে তোমার ছেলেটাকে নিয়ে শ্মশানে যাও। আমি গোবর জল দিয়ে জায়গাটাকে শুদ্ধ করে নিই।

শৈব্যা। না-না আমি শ্মশানে যাবোনা। আমার ছেলে মরেনি। ক্ষিধেতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমো বাবা—প্রাণ ভরে ঘুমো।

তীর্থ। ওঃ ব্রাহ্মণী, তুমি কি নিষ্ঠুর! জানিনা ভগবান কোন উপাদান দিয়ে তোমাকে তৈরী করেছেন। শোকাতুরাকে সান্ত্বনা দেওয়া তো দূরে থাক—উপরন্তু তুমি—

কুমতি। থামো—থামো, তোমাকে আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে

না। একে এই ভরা অমাবস্যার রাত তার উপর শনিবার। মরা ছেলেকে ঘরে রেখে সংসারের অকল্যাণ আমি করতে পারবো না।

শৈব্যা। কি অকল্যাণ হবে! একটা নিষ্পাপ শিশুর মৃতদেহের সামনে একথা তুমি বলতে পারলে? পারবেই তো—পারবেই তো—তুমি তো আর মা নও।

কুমতি। ন্যাকা মাগী কোথাকার! কে-না জানে শনি মঙ্গলবারে মরলে চারপোয়া দোষ পায়—সংসারের অকল্যাণ হয়?

শৈব্যা। না-না মা, আমার ছেলের জন্যে তোমার সংসারে আমি অকল্যাণ হতে দেব না।

তীর্থ। কি আর বলবো ব্রাহ্মণী, সন্তানের মাতো আর হওনি—তাই সন্তান হারা মায়ের বুকে যে কি ব্যথা—তোমার মত দানবী তা বুঝতে পারবে না।

কুমতি। কি—আমি দানবী!

তীর্থ। শুধু দানবী নও, তুমি রাক্ষসী—তুমি কালভুজঙ্গিনী।

কুমতি। কি—এতবড় কথা—

শৈব্যা। থাক—থাক বাবা, আমার জন্য আপনারা নিজেদের মধ্যে আর অশান্তি করবেন না। আমি এখুনি আমার ছেলেকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এ বেশ ভালোই হয়েছে মা—ভালোই হয়েছে। ক্ষিধে সইতে না পেরে আর রোহিত তোমার কাছে খেতে চাইবে না। আর তুমি রোহিতকে রুটি চুরির অপবাদ দিতে পারবে না। রোহিত আমার সব ক্ষিধে তৃষ্ণা জয় করে চির শান্তিধামে চলে গেছে।

কুমতি। বেশ করেছে, এইবার তুমি ছেলেকে নিয়ে বিদেয় হও।

শৈব্যা। যাচ্ছি মা—যাচ্ছি। তোমার সংসারের যখন অকল্যাণ হবে—তখন আর কি আমি এখানে থাকতে পারি!

তীর্থ। তাই যা মা—তাই যা, এখান থেকে চলে গিয়ে তুই নিষ্কৃতি পা। আমি তোকে একদিন কিনে এনেছিলাম, আজ আমিই তোকে দাসীত্বের বন্দী থেকে মুক্তি দিলাম। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও মুক্তি নিয়ে চলে যাচ্ছি।

কুমতি। সেকি—তুমি কোথায় যাবে!

তীর্থ। যেদিকে দু-চোখ যায়—সেইদিকে যাবো। তাতে যদি লোকে দুর্নাম দেয়—দিক, মহাপাপ হয়—হোক, তবু তোমার মত কালনাগিনীকে নিয়ে আর আমি সংসার করবো না।

শৈব্যা। বাবা—বাবা—

তীর্থ। না-না—আমাকে তুই বাবা বলে ডাকিস না মা, আমি তোর বাবা ডাকের যোগ্য নই। আমি মহাপাপী। ঐ ছলনাময়ীর ছলনায় ভুলে আমার সারাজীবনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমিই একদিন তোকে কিনে এনেছিলাম, আমারই জন্য তুই অনেক নির্যাতন ভোগ করেছিস। আজ আবার আমারই ফুল তুলতে গিয়ে তোর ছেলে সর্পাঘাতে মরেছে। তুই আমাকে অভিশাপ দে মা—অভিশাপ দে—জন্ম-জন্মান্তর যেন আমার অনন্ত নরকবাস হয়। [প্রস্থান।

কুমতি। ব্যস, আমার কাজ শেষ। জয়ী যখন হতেই পারলাম না তখন মরণ কামড় দিয়ে গেলাম। মায়া অট্টালিকা—শূন্যে মিলিয়ে যাও। কুমতি—তুমিও তোমার স্বামীর কাছে ফিরে চল।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। একি—দেখতে দেখতে অট্টালিকা কোথায় মিলিয়ে গেল! এ যে নির্জন বনভূমি! কোথাও কোন মানুষের সাড়া শব্দ নেই। চারিদিক কি ভীষণ অন্ধকার! কোনদিকে যাই? কে বলে দেবে কোথায় সেই মহাশ্মশান? ওকি—আলো হাতে কে তুমি পথিক? দাঁড়াও—

একটু দাঁড়াও, আমার ছেলের সৎকারের জন্য শ্মশানের পথ দেখিয়ে দাও! রোহিত—রোহিত, ঘুমুচ্ছিস বাবা—ঘুমো—ঘুমো—প্রাণ ভরে ঘুমো। এ ঘুম যেন আর না ভাঙ্গে। তাহলে আবার তোকে ক্ষিধের জ্বালা সইতে হবে। চল—চল বাবা—আমি তোকে সেইখানেই নিয়ে যাবো—সেই মহাশ্মশানের তীর্থক্ষেত্রে—যেখানে মানুষের এই নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওঃ ভগবান, এতবড় পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে আমার ছেলেটার জন্য একটু জায়গা হ'ল না?

[রোহিত সহ প্রস্থান।

———

ষষ্ঠদশ দৃশ্য।

শ্মশান।

হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। আকাশে ঝড় উঠেছে, শোঁ-শোঁ করে বাতাস বইছে, বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে বারাণসীর জলও কেমন ফেঁপে ফুলে উঠেছে। আমার মনে—আমার মনেও ঠিক ঐরকম উত্তাল তরঙ্গ বয়ে চলেছে। বার বার স্মৃতির দাহ আমাকে পাগল করে তুলছে, না-না—মন, তুমি সংযত হও, তুমি যে ক্রীতদাস—এ চঞ্চলতা তোমার শোভা পায় না।

মহেশের প্রবেশ।

মহেশ। আই বাপরে বাপ, কি ভীষণ ঝড়-জল আরম্ভ হয়েছে! চারিদিকে বাজ পড়ছে! এই ব্যাটা হরিশ!

হরিশ্চন্দ্র। আমি ঠিক আছি সর্দার।

মহেশ। দেখছিস কেমন পেল্লায় শুরু হয়েছে!

হরিশ্চন্দ্র। কোন চিন্তা নেই সর্দার, আমি ঠিক ঘাটোয়ালের কাজ করে যাবো।

মহেশ। না-না—আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, আজ আর তুই শ্মশানে থাকিসনি। বিপদ হতে পারে। তার চেয়ে ভালো—ডেরায় গিয়ে রুটি খেয়ে ঘুমুবি চল। তারপর কাল সকালে আবার কাজ-কাম করিস।

হরিশ্চন্দ্র। কিন্তু এই দুর্যোগ মাথায় করে যারা মড়া নিয়ে আসবে—তাদের কি হবে সর্দার?

মহেশ। সেতো বুঝলাম। কিন্তু এই পেল্লায়ের মাঝে তুই কাজ করবি কি করে ব্যাটা?

হরিশ্চন্দ্র। বাবা বিশ্বনাথের নাম নিয়ে ঠিক করবো। তোমার কোন চিন্তা নেই সর্দার।

মহেশ। তোর কি ভয়ডর কিছু নেইরে ব্যাটা!

হরিশ্চন্দ্র। একদিন তো বলেছি সর্দার, আমি ভয়কে জয় করে বসে আছি। এখন ভয়ই হয়তো আমাকে দেখলে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।

মহেশ। কি বলছিস ব্যাটা!

হরিশ্চন্দ্র। দেখ—দেখ সর্দার, প্রকৃতি আজ কি সুন্দরভাবে সেজেছে। মনে হচ্ছে—সতীহারা শিব আজ প্রলয় নাচন নাচছে।

[বজ্রপাত]

মহেশ। হাই বাপ, এখুনি হয়তো আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়বে।

হরিশ্চন্দ্র। পড়ুক, তবু আমার কাজে এতটুকু ত্রুটি হবে না। তুমি ডেরায় ফিরে যাও সর্দার, কাল সকালেই আমি তোমাকে ঘাটের কড়ি বুঝিয়ে দেব।

মহেশ। আরে সেতো দিবি। কিন্তু আমি যে তোকে ছেলে বলেছি রে, এই বিপদের মুখে তোকে ফেলে কি করে আমি ডেরায় গিয়ে ঘুমুই বলতো?

হরিশ্চন্দ্র। কোন ভয় নেই সর্দার, আমার কোন বিপদ হবে না। তোমার আশীর্বাদে আমার সব বিপদ দূর হয়ে যাবে। তুমি যাও—তুমি যাও।

মহেশ। ঠিক আছে, যাচ্ছি। কিন্তু তুই খুব সাবধানে থাকিস ব্যাটা। তারপর আজকের রাতটা শেষ হলে আমি তোকে ছুটি দিয়ে দেবো—একেবারে ছুটি দিয়ে দেবো। [প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—সর্দার আমাকে ছেলের মত ভালোবাসে, তাই আমার বিপদের আশঙ্কায় আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলো। কিন্তু—ওকথা বললে কেন? কেন বললে—কাল সকালে আমাকে ছুটি দিয়ে দেবে—একেবারে ছুটি।

নেপথ্যে শৈব্যা। কে আছো শ্মশানে—কে আছো বান্ধব—

হরিশ্চন্দ্র। ঐ আবার কে কাকে ফাঁকি দিয়ে পৃথিবী থেকে ছুটি নিয়ে চলে গেল। এসো—এইদিকে এসো—আমি আছি—এ ঘাটের ঘাটোয়াল।

মৃত রোহিতাশ্বকে কোলে নিয়া শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। কে—কেগো তুমি, অন্ধকারে তোমাকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না। এই কি শ্মশান? তুমি কি এই ঘাটের—

হরিশ্চন্দ্র। ঘাটোয়াল—মানে চণ্ডাল। তুমি বুঝি মড়া এনেছো? রাখো—রাখো, আমি এখুনি সৎকার করে দেবো। বৃষ্টিটা একটু কমে যাক, নইলে যে চিতা জ্বলবে না। হ্যাগো—কে মরেছে তোমার?

শৈব্যা। আমার ছেলে—আমার একমাত্র বুকের মাণিক।

হরিশ্চন্দ্র। একি—কণ্ঠস্বর এত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে কেন! মনের মধ্যে এমন তোলপাড় করছে কেন! না-না—এ আমার মনের দুর্বলতা—শোনার ভুল। নারী, কি হয়েছিল তোমার ছেলের—কি রোগে মারা গেছে?

শৈব্যা। রোগ নয় চণ্ডাল—সর্পাঘাতে।

হরিশ্চন্দ্র। সর্পাঘাতে!

শৈব্যা। শুনেছি—তোমরা অনেক মন্ত্র-তন্ত্র জানো, দেখো না চণ্ডাল—সেই মন্ত্রের জোরে বাছাকে আমার ফিরিয়ে দিতে পারো কিনা?

হরিশ্চন্দ্র। আমি মন্ত্র-তন্ত্র জানি না নারী, জানি শুধু মৃতদেহ পুড়িয়ে ছাই করে দিতে। ঐ বৃষ্টি কমে এসেছে, এখুনি আমি চিতায় আগুন জ্বালবো। দাও—কড়ি দাও।

শৈব্যা। কড়ি—

হরিশ্চন্দ্র। হ্যা—বিশ কাহন কড়ি।

শৈব্যা। কিন্তু আমার কাছে যে এক কপর্দকও নেই চণ্ডাল—

হরিশ্চন্দ্র। নেই! কিন্তু কড়ি না হলে তো আমি তোমার ছেলেকে সৎকার করতে পারবো না নারী।

শৈব্যা। দয়া কর চণ্ডাল—দয়া কর।

হরিশ্চন্দ্র। দয়া—হাঃ-হাঃ-হাঃ—চণ্ডালের কাছে এসেছো দয়া ভিক্ষা করতে! না-না—সারাদিন যাকে মড়া জ্বালাতে হয়, নির্মম নিষ্ঠুরের মত মড়ার খুলি ভাঙ্গাই যার কাজ—তার মনে দয়া থাকতে নেই নারী;

শৈব্যা। অভাগিনীর উপর তুমি এত নির্দয় হয়োনা। ঘাটোয়াল—চণ্ডাল হলেও তুমিওতো মানুষ, তোমারওতো স্ত্রী-পুত্র আছে।

হরিশ্চন্দ্র। আঃ—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—

শৈব্যা। বিশ্বাস কর—আমি বড় অসহায়—বড় নিরুপায়। দয়া করে তুমি আমার ছেলেকে সৎকার করে দাও! আমি সারাজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।

হরিশ্চন্দ্র। তাইতো—কি করি—কোনদিকে যাই! একদিকে প্রভুর আদেশ, অন্যদিকে পুত্র-শোকাতুরা জননীর কাতর অনুরোধ। না-না—আমি যে কর্তব্যের দাস। আমি যে সত্যে আবদ্ধ। প্রাণান্তেও প্রভুর আদেশ অমান্য করতে পারবো না। যাও নারী—যাও, আমার কাছে দয়া-মায়া নেই। কড়ি দিলে তোমার ছেলের সৎকার হবে—নইলে হবে না।

শৈব্যা। হবে না! তবে কি সত্যি সত্যিই বিশ্বেশ্বরের রাজত্বে কড়ির অভাবে আমার ছেলের সৎকার হবে না! বলে দাও—বলে দাও ওগো বিশ্বের ঈশ্বর—বিশ্বেশ্বর—এও কি তোমারই ইচ্ছা?

হরিশ্চন্দ্র। আচ্ছা নারী, একটা কথা বলবে—এই অমাবস্যার রাতে জল-ঝড় মাথায় করে তুমি তোমার মৃত ছেলেকে বুকে করে এনেছো কেন?

শৈব্যা। কি করবো চণ্ডাল, আমি যে সহায় সম্বলহীন।

হরিশ্চন্দ্র। কেন তোমার স্বামী নেই?

শৈব্যা। আছেন। কিন্তু তিনি যে কোথায়—

হরিশ্চন্দ্র। বুঝেছি—বুঝেছি, নিশ্চয়ই সে তোমার দেখাশোনা করে না। নিশ্চয়ই সে নির্মম—নিষ্ঠুর।

শৈব্যা। সাবধান চণ্ডাল, মনে রেখো—সতীনারী কখনও পতিনিন্দা সহ্য করে না।

হরিশ্চন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ভুলে যাই—ভুলে যাই এই নারী জাতটা

সব একসূত্রোয় গাঁথা। এরা বুক পেতে স্বামীর দেওয়া আঘাত হাসিমুখে সহ্য করে—কিন্তু স্বামীর নিন্দে সহ্য করতে পারে না। সেও ঠিক এমনি ছিল। সেও স্বামীর নিন্দে শুনলে ঠিক এমনিভাবে গর্জন করে উঠতো।

শৈব্যা। চণ্ডাল, তাহলে সত্যিই আমার ছেলেকে নিয়ে ফিরে যাবো? সত্যিই কি কড়ির জন্যে তুমি আমার ছেলের সৎকার করে দেবে না?

হরিশ্চন্দ্র। এ্যাঁ—সৎকার? হ্যাঁ-হ্যাঁ—হতে পারে এক শর্তে—

শৈব্যা। বল বল চণ্ডাল—কি শর্তে?

হরিশ্চন্দ্র। যদি তোমার কাপড়ের আধখানা কেটে দিতে পারো।

শৈব্যা। চণ্ডাল! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—তুমি কি মানুষ!

হরিশ্চন্দ্র। আমি শুধু চণ্ডাল। আমি শুধু প্রভুর দাস। তার আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র ধর্ম। তুমি যাও—তুমি যাও নারী। তোমার কথা, তোমার কণ্ঠস্বর আমি যত শুনছি ততই দুর্বল হয়ে যাচ্ছি; তুমি যাও, তুমি যাও—

শৈব্যা। বেশ আমি চলেই যাচ্ছি। চল বাবা—চল ওরে অভাগা—কেউ যখন এই দুখিনীর দুঃখ বুঝলো না, আগুন যখন তোকে স্পর্শ করলো না—তখন আমিই তোকে বুকে নিয়ে ঐ উত্তাল তরঙ্গময়ী ভাগীরথীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বো রোহিত।

হরিশ্চন্দ্র। [বিকট চিৎকার করিয়া] আঃ—

শৈব্যা। কি হ'ল চণ্ডাল?

হরিশ্চন্দ্র। বুকের জমাট ব্যথায় বিরাট একটা আঘাত লাগলো। তাই বুকখানা বড় জ্বলে যাচ্ছে। দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা একসঙ্গে গর্জন করে উঠেছে, অস্থি-পিঞ্জর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে—[সহসা বিদ্যুৎ

চমকায়] একি—একি—বিদ্যুতের আলোয় আমি একি দেখলাম ! একি আমার দৃষ্টিভ্রম ! বিদ্যুৎ, আর একবার স্ফুরণ হও—আর একবার ভালো করে দেখতে দাও।

শৈব্যা। চণ্ডাল—চণ্ডাল—

হরিশ্চন্দ্র। বল নারী—বল নারী—কি নাম বললে তোমার ছেলের ?

শৈব্যা। রোহিত।

হরিশ্চন্দ্র। কোন রোহিত ? কোথাকার রোহিত ? বল—বল নারী, এর বাবার নাম কি হরিশ্চন্দ্র ?

শৈব্যা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কিন্তু তুমি—

হরিশ্চন্দ্র। ওঃ ভগবান ! রোহিত—রোহিত আমার—[ক্রন্দন]

শৈব্যা। তবে তুমি—তুমিই—

হরিশ্চন্দ্র। আমিই সেই ভাগ্যহত হরিশ্চন্দ্র।

শৈব্যা। স্বামী—স্বামী ! ওঃ ভগবান, এও আমাকে দেখতে হ'ল ! সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর আজ চণ্ডালের দাস। এ দৃশ্য দেখার আগে মৃত্যু দিলে না কেন ?

হরিশ্চন্দ্র। এতে আমার কোন দুঃখ নেই শৈব্যা, কিন্তু রোহিত যে আমার হারিয়ে গেল—এ দুঃখ যে আমি আর সহিতে পারছি না ! বজ্র—তুমি নীরব কেন ! রোহিত যখন গেছে তখন একটা বজ্রপাতে আমাদের স্বামী-স্ত্রীকেও মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও—।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র—

হরিশ্চন্দ্র। কে—কে আমাকে মহারাজ বলে সম্বোধন করলে !

বিশ্বামিত্র। আমি—বিশ্বামিত্র।

হরিশ্চন্দ্র। একি—রাজর্ষি! তুমি এই শ্মশানে! আর তো তোমাকে দেবার আমাদের কিছুই নেই—সবই তো দিয়েছি! বাকি আছে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রাণ। তাও যদি চাও—আমরা হাসতে হাসতে দিতে পারি।

বিশ্বামিত্র। আর আমাকে গঞ্জনা দিওনা রাজা। আমি কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত; তাই তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

হরিশ্চন্দ্র। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—রাজর্ষি, ওকথা বলে আমাদের নরকে নামিয়ে দিওনা।

বিশ্বামিত্র। না-না—নরক তোমাদের জন্য নয়—তোমাদের জন্যে অনন্ত স্বর্গ। ক্ষমা কর হরিশ্চন্দ্র! তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে অন্তর্দাহে আমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি!

হরিশ্চন্দ্র। রাজর্ষি—

বিশ্বামিত্র। অযোধ্যায় ফিরে চল রাজা—।

হরিশ্চন্দ্র। অযোধ্যায় ফিরে যাবো!

বিশ্বামিত্র। তোমার রাজ্য—ঐশ্বর্যও ফিরিয়ে নাও।

হরিশ্চন্দ্র। ক্ষমা কর রাজর্ষি, ওকথা আমি রাখতে পারবো না। একবার যা দান করেছি আর তা ফিরিয়ে নেবো না। অযোধ্যা তোমার—তুমি অযোধ্যার রাজা।

বিশ্বামিত্র। তাহলে আমার রাজ্য আমি যাকে খুশি দান করতে পারি?

হরিশ্চন্দ্র। সে তোমার অভিরুচি।

বিশ্বামিত্র। উত্তম। ঐ দেখ পূব আকাশে সূর্যদেব উদিত হয়েছে, সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে বলছি—কুমার রোহিতাশ্বকে আমার রাজ্য

দান করলাম। দাও—কুমার রোহিতাশ্বকে আমার হাতে তুলে দাও—আমি তাকে অযোধ্যায় নিয়ে যাবো।

হরিশ্চন্দ্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কুমার রোহিতাশ্বকে রাজ্য দান করবে! তাকে অযোধ্যায় নিয়ে যাবে! ঐ দেখ তবে কুমার রোহিতার মৃত দেহ।

বিশ্বামিত্র। সেকি! রোহিতাশ্ব—

শৈব্যা। ঘুমিয়ে পড়েছে ঋষি। বাছা আমার সর্পদংশনে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে; এ ঘুম আর ভাঙ্গবে না।

বিশ্বামিত্র। রোহিতাশ্ব মৃত! ওঃ—

সত্যসন্ধের প্রবেশ।

সত্যসন্ধ। হ্যাঁ, তোমাকেই ঐ দেহে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে।

হরিশ্চন্দ্র। কে? একি—সত্যসন্ধ—তুমি! এখানে!

বিশ্বামিত্র। সত্যসন্ধ নয় রাজা, সত্যসন্ধের ছদ্মবেশে স্বয়ং ধর্ম।

সকলে। রাজর্ষি—

বিশ্বামিত্র। অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে কুমতির মন্ত্রণায় এতদিন আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সব আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠের কৃপায় আজ আমি সব ফিরে পেয়েছি। তাই তোমাকে চিনতে পেরেছি; তুমি স্বয়ং ধর্ম।

হরিশ্চন্দ্র। ভাগ্যবান—ভাগ্যবান হরিশ্চন্দ্র। তুমি আমার প্রণাম নাও দেব। আশীর্বাদ কর—সব কিছুর বিনিময়ে আমি যেন তোমাকে ধরে রাখতে পারি।

সত্যসন্ধ। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, ধর্ম অধর্মের দ্বন্দ্বে তোমাকে আমরা পরীক্ষা সাগরে নিক্ষেপ করেছিলাম। বিক্রমজিৎ-রূপী অধর্ম তোমাকে

...ছিল নরকর্মী করতে, আর আমি চেয়েছিলাম তোমার মনোবল ...া করতে। সে পরীক্ষায় তুমি আজ উত্তীর্ণ। আরও শোন, তোমাকে যিনি ক্রয় করেছিলেন তিনি চণ্ডাল নন—চণ্ডালের ছদ্মবেশে স্বয়ং বিশ্বনাথ।

হরিশ্চন্দ্র। বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ, তাই বুঝি তুমি বলেছিলে প্রভু—আজ রাত শেষে আমাকে ছুটি দেবে—একেবারে ছুটি—।

সত্যসন্ধ। রাজর্ষি, এই বার তুমি কুমারের দেহে প্রাণ দান কর।

বিশ্বামিত্র। আমি—!

সত্যসন্ধ। হ্যাঁ—তুমি। যে কুমতির কুমন্ত্রণায় তুমি সব কিছু হারিয়েছিলে, সেই কুমতিই যে ওকে সর্পরূপে দংশন করেছে। তাই তোমাকেই ওর দেহে প্রাণ দান করে কুমতির সব দর্প চূর্ণ করতে হবে।

বিশ্বামিত্র। সে ... কি আজ আমার আছে ধর্ম ?

সত্যসন্ধ। আছে আছে। অনুতাপের আগুনে পুড়ে আবার তুমি খাঁটি ব্রাহ্মণ হয়েছ। আবার তুমি তোমার ব্রহ্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলো। জগৎবাসী দেখিয়ে দাও—রাজর্ষির ব্রহ্মশক্তি লুপ্ত হয়ে যায়নি।

শৈব্যা। ফিরিয়ে দাও রাজর্ষি—ফিরিয়ে দাও, বাছাকে আমার ফিরিয়ে দাও। আর তোমার যশোগানে দশদিক ভরে উঠুক।

বিশ্বামিত্র। গুরুদেব, এমন আকুলভাবে তোমাকে কোনদিন ডাকিনি। সাড়া দাও, আবার আমার হৃদয়ে পূর্ণভাবে অধিষ্ঠান হও। এসো বীজমন্ত্র, এসো গো গায়ত্রী—ওঁ আয়াহি বরদে দেবী—এক্ষরে ... গায়ত্রী ... সাত ব্রহ্মযোনী নমস্ততে। [কিছুক্ষণ গায়ত্রী ... কমণ্ডলু-বারি রোহিতের গায়ে ছিটিয়ে দেয়] রোহিত, ওঠো—ঘুম ভেঙে ওঠো—।

রোহিতাশ্ব। মা—মা—

শৈব্যা। রোহিত—রোহিত—মাণিক আমার—

হরিশ্চন্দ্র। রোহিত—রোহিত—আমার বুকে আয়—

রোহিতাশ্ব। একি—বাবা—বাবা! মা—মা, তাহলে [illegible] আমার সত্য!

শৈব্যা। স্বপ্ন—!

রোহিতাশ্ব। হ্যাঁ মা, আমি স্বপ্নে দেখলাম—আমি তোমাদের কাছে আছি। আর রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, সত্যসন্ধ দাদা আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছে।

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ বাবা, তোমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। এই দেখ সামনেই তোমার সেই স্বপ্নের দেবতা। এসো আমরা একসঙ্গে দেবতাদের প্রণাম করি!

বিশ্বামিত্র। আশীর্বাদ করি—এইভাবেই তোমরা ধর্মের মান উজ্জ্বল করে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকো।

সত্যসন্ধ। যথা ধর্ম তথা জয়। ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—

[সকলের প্রস্থান।

ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস—১৯।এ।এইচ।৫, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি—হইতে শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।